বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ,
আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা

১৪২৯ ▪ ২০২২

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ১৪২৯/২০২২ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ মঈনুদ্দিন খান
উপ প্রধান বন সংরক্ষক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং

হোসাইন মুহাম্মদ নিশাদ
বন সংরক্ষক, প্রশাসন ও অর্থ

ইমরান আহমেদ
বন সংরক্ষক, ঢাকা সামাজিক বন অঞ্চল

ড. মোঃ জাহিদুর রহমান মিয়া
পরিচালক, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

Souvenir on the occasion of 'National Tree Plantation Campaign and Tree Fair 2022'

Published by
Forest Department, Bangladesh

মুদ্রণ ঃ
বেঙ্গল কম প্রিন্ট
ফোন ০১৭৯৮১৪৭৯০৭

প্রকাশকাল ঃ
জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/ জুন ২০২২

বন অধিদপ্তর
বন ভবন
প্লট নং ই৮ বি২, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

www.bforest.gov.bd

বিষয় সূচি

১. "বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ"
মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী ১৭

২. Collaborative Forest Management- Sufal Project Anticipates Success Stories for Bangladesh Forest Department
Gobinda Roy and Dr. Mohammad Zahirul Haque ২০

৩. Watershed Co-management Initiative in Chittagong Hill Tracts Through Sid-cht Project
Md. Moyeenuddin Khan & Md. Oli Ul Haque ৩৩

৪. Making The Case For Green Spaces For Urban Sustainability: A Focus on The City Of Dhaka
Niaz Ahmed Khan, Ph.D. and Sultana Razia ৩৫

৫. উপকূলীয় বনায়নে বন অধিদপ্তরের সাফল্য
মোঃ মঈনুদ্দিন খান ও মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ খান ৩৯

৬. নিজেরই ঘরে আগুন
মনিরুজ্জামান বাদল ৪৩

৭. Biodiversity Conservation and Human Health: One Health Approach
Md. Jahidul Kabir ৪৪

৮. সাদা শেয়ালের চমক
ড. মনিরুল এইচ খান ৪৬

৯. কেন এবং কীভাবে সুন্দরবনের বাঘ গণনা করা হয়
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ৪৭

১০. Sundarbans Biodiversity and Research Needs for Conservation
Dr. Tapan Kumar Dey ৪৯

১১. Socioeconomic Impact of Eco-tourism of Nijhum Dweep National Park
Md Saidur Rashid ৫৩

১২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামাজিক অংশগ্রহণ: বিবিসিএফ মডেল
মোল্যা রেজাউল করিম ৫৭

১৩. Development Dilemma of Achieving Sustainable Development Goals (Sdgs): Insights From Forest, Environment and Climate Change Sectors
Dr. Md. Saifur Rahman ৬২

১৪. Lalmai Botanical Garden (Lbg) At A Glance
Imran Ahmed ৬৫

১৫. স্বর্গের ফুল পারিজাত
ড. সানজিদা মুবাশ্‌শারা ৬৯

১৬. State of Urban Forestry in Bangladesh
Dr. Md. Zahidur Rahman Miah ৭২

১৭. নীরব ঘাতক বায়ু দূষণ
ড. মর্জিনা বেগম ৮১

১৮. Antidiabetic, Antihypertensive and Anticancer Plants Gynura (Gynura Procumbens (Lour.) Merr.)
Md Golam Moula & Tanmoy Dey ৮৩

১৯. Safeguards In Forests Management of Bangladesh
Md. Shams Uddin ৮৬

২০. Wildlife Farming: Does It Really Help In Conservation?
Md. Modinul Ahsan, PhD ৯২

২১. Forestry in Poverty Alleviation and Climate Change Mitigation: Viewing From Institutional Frameworks
Dr. Md. Nazmus Sadath ৯৭

২২. Diversity of Angiosperm Flora of Kuakata National Park, Patuakhali District, Bangladesh
M. Azizar Rahaman, Md. Azizur Rahman and Mohammad Zashim Uddin ১০০

২৩. অস্তিত্বের সংকটে হরিপুর চরের পাখি ঃ সংরক্ষণ উদ্যোগ অপরিহার্য
ফারিহা ইকবাল পাফিন ১০৭

২৪. Wildlife Tuberculosis (Tb): A Hidden Treat For Wildlife Conservation In South Asia Including Bangladesh
Dr. Md. Nizam Uddin Chowdhury ১১০

২৫. সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য
ড. আসম হেলাল সিদ্দীকি ১১২

২৬. Factors Affecting on The Beneficiaries' Effectiveness of Social Forestry
Dr. Md. Golam Mortoza & Imran Ahmed ১১৫

২৭. কোভিড-১৯
নির্মল কুমার পাল ১২৫

২৮. বৃক্ষ রোপণঃ মহানুভব খলিফা এবং প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধের হৃদয়স্পর্শী গল্প
সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুল আনোয়ার ১২৬

২৯. উপকূলীয় বন গবেষণায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা
মো. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া ১২৮

৩০. দুর্লভ পাখির সন্ধানে
আল্লামা শিবলী সাদিক, পাখিবিদ ১৩২

৩১. বায়ু দূষণমুক্ত রাখতে গাছপালার ভূমিকা
আফতাব চৌধুরী ১৩৫

৩২. এক সবুজ আগামীর লক্ষ্যে 'বনায়ন'
আহমেদ রায়হান আহসানউল্লাহ ১৩৭

৩৩. আমাদের লোকজ উদ্ভিদের লোকায়ত ব্যবহার
ড. সানজিদা মুবাশ্‌শারা ও ড. মোঃ জাহিদুর রহমান মিয়া ১৩৯

৩৪. Fauna of Bhawal National Park, Gazipur
Mihir Ranjan Dey & Md. Shohel Rana ১৪৩

৩৫. কাজীরবাগ ইকো পার্কঃ প্রকৃতি-পর্যটনের হাতছানি
তানজিল আসিফ তানহা ১৪৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২' আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বন-বনানী ঘেরা, সবুজ শ্যামল আমাদের এ দেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য, জ্বালানি, বাসস্থান, আসবাবপত্রের চাহিদা পূরণ এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কারণে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয়রোধ, মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নে বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার দেশব্যাপী ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বনায়ন কার্যক্রমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ফলে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের কার্যকর ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদের ক্ষমতায়নসহ টেকসই উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২ এর প্রতিপাদ্য 'বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সফল ও টেকসই রূপ দিতে হলে জনগণকে দেশের আবহাওয়া ও মাটির উপযোগী বনজ, ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি রোপণকৃত বৃক্ষের পরিচর্যার জন্যও যথাযথ পরামর্শ প্রদান ও সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এবছর বৃক্ষরোপণে অবদান রাখার জন্য 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০১৯ ও ২০২০' এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০২০ ও ২০২১' প্রাপ্তদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে বৃক্ষরোপণ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২ সফল হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ' যৌক্তিক এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এ বছর যারা 'বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২০ ও ২০২১', 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০১৯ ও ২০২০', এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়েছেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ এই বাংলাদেশ। মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরণসহ প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ টেকসই পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, কার্বন আধার সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আওয়ামী লীগ সরকার টেকসই বন ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক বনায়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করেছে। ফলে বনজ সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম জোরদার হওয়ায় দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের মোট ভূমির ২২.৩৭%; আমাদের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এ হার আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ২৫%-এ উন্নীত করা সম্ভব হবে।

আমি প্রত্যেককে কমপক্ষে একটি করে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপনের আহ্বান জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার' বাংলাদেশ' আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

পৃথিবীর সকল প্রাণীর সুস্থ্য জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। বৃক্ষরাজি তপ্ত পৃথিবীকে স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় রূপান্তর করে বাসোপযোগী করে তুলছে, প্রাণ দান করছে নিযুত প্রাণির মাঝে। এছাড়াও জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে অনাদিকাল থেকে বৃক্ষ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

যুদ্ধ বিধ্বস্থ স্বাধীন বাংলাদেশের বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী ব্যাপক বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রকৃতি-প্রতিবেশ বিশেষতঃ নদী, পাহাড়, বন ও বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর। আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই উন্নয়নকে ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখতে দেশের প্রকৃতি পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করতে সকলকে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের সকল বনভূমি এবং বনভূমির বাইরের বৃক্ষরোপণ উপযোগী সকল প্রান্তিক ভূমিকে বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের বন ভূমির পরিমান মোট ভূমির ১৬% এ এবং দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন ২৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা কার্যতম অব্যাহত আছে। এলক্ষ্যে এ সরকারের আমলে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর বাগান সৃজন এবং জনগণের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ এর এবছরের প্রতিপাদ্য-"বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ"। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশকে আরও সবুজে আচ্ছাদিত করার লক্ষ্যে এ বছরও জাতীয় পর্যায়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। উন্নত প্রজাতির বৃক্ষের সাথে পরিচয় এবং চারা সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমেলার আয়োজন সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ বছর যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৯ ও ২০২০", "বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২০ ও ২০২১" এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়েছেন আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২-এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.)

উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরা আমাদের এদেশ। প্রকৃতিকে সাজাতে এদেশে গড়ে উঠেছে পাহাড়ী বন, শালবন, সুন্দরবন, জলাভূমির বন, উপকূলীয় বন, গ্রামীণ বন ও প্রান্তিক জনপদের বিভিন্ন ধরণের অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বন। ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, বনজ সম্পদের বহুমাত্রিক চাহিদা ও ব্যবহার, শিল্পায়ন ও নগরায়নের বিস্তৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দেশের এসব প্রাকৃতিক বন ও সৃজিত বন আজ হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই বাংলাদেশ গড়তে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এজন্য জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ এর প্রতিপাদ্য **"বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ"** খুবই যৌক্তিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবেশ সুরক্ষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপকূলীয় এলাকাসহ সারাদেশে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, বন্যপ্রাণী ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও অবক্ষয়িত বন পূনরুদ্ধারের পাশাপাশি বিগত কয়েক দশকে বন অধিদপ্তর কর্তৃক দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় দুই লক্ষ হেক্টরের অধিক সুন্দরবন সাদৃশ ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করেছে যা গ্রীনবেল্ট হিসাবে কাজ করছে। সৃজিত উপকুলীয় বন ও সুন্দরবন প্রাকৃতিক দেয়ালের কাজ করে দক্ষিণাঞ্চলের জনগনের জানমাল ও সম্পদ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়া আধুনিক বন ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে SMART(Spatial Monitoring and Reporting Tools) পেট্রোলিং ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা।

এ বছর যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার,২০১৯ ও ২০২০" এবং "বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২০ ও ২০২১" এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

হাবিবুন নাহার, এমপি

সভাপতি
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

বৃক্ষ প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে বৃক্ষ বিশেষ অবদান রাখে। প্রতিবেশ-পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য টেকসই পৃথিবী বিনির্মাণে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে "বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ"- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ উদযাপন করা হচ্ছে।

বৃক্ষের প্রধান আধার হচ্ছে বন । কিন্ত বসতবাড়ি নির্মাণ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং কৃষি জমির সম্প্রসারণে হ্রাস পাচ্ছে বনভূমির পরিমাণ। বনের পরিমাণ যতই কমে যাচ্ছে ততই ভারসাম্য হারাচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশ অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন Nature Based Solution অর্থাৎ প্রকৃতিকে বিনষ্ট না করে সমন্বিত উন্নয়ন- যার জন্য প্রয়োজন ব্যাপকহারে বনায়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের যুগোপযোগী বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নতুন বন সৃষ্টিসহ অবক্ষয়িত ও জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে এবং বনভূমির বাইরেও উপযোগী প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন করা হচ্ছে। বন ব্যবস্থাপনায় সামাজিক বনায়ন ও সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যার ফলে বনভূমি, বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী যেমন কার্যকরভাবে সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তেমনি টেকসই বন ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

এবছর যারা ''বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০১৯ ও ২০২০", ''বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২০ ও ২০২১ এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়েছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

সাবের হোসেন চৌধুরী, এম.পি

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

বন, জঙ্গল, গ্রামীণ এবং জলাভূমির জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এদেশের প্রকৃতি। বৃক্ষরাজি বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে মানুষসহ সকল প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে; প্রাণহীন মাটিতে বৃক্ষজাত জৈব সংযোজনের মাধ্যমে মাটি ও কৃষি জমিকে করছে উর্বর এবং পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহের মাধ্যমে প্রাণিকূলকে দান করছে সজীবতা। তাছাড়া বৃক্ষ সম্পদ ফলফলাদি, চিকিৎসার কাঁচামাল ও পশুখাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে মানুষসহ প্রাণিকূলকে রাখছে সুস্থ্য ও সবল। বনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মনপ্রাণকে করে সতেজ ও প্রফুল্ল। তাছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় বনের ভূমিকা অনস্বীকার্য ।

নতুন জনপদ সৃষ্টি, নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে দেশের সীমিত বনাঞ্চলের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান বন সংরক্ষণ, অবক্ষয়িত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং গ্রামীন বনায়ন কার্যক্রমকে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

UNFCCC কর্তৃক আয়োজিত Cop-26 এর "Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Landuse" এ বন সংরক্ষণ, অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার এবং বন ধ্বংস রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল অংশীজনদের নিয়ে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করে বিশ্বের ১৪১টি দেশের সাথে বাংলাদেশও স্বাক্ষর প্রদান করে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ বন ধ্বংস ও ভূমি ক্ষয় বন্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সোপানে। রূপকল্প-২০৪১ এ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। উন্নত বিশ্বের আসনে পৌঁছাতে আমাদেরকে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব সমন্বিত পরিকল্পনা।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২ এর প্রতিপাদ্য "বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ" -কে সামনে রেখে আগামী প্রজন্মের জন্য সুস্থ-সুন্দর, নির্মল ও টেকসই প্রকৃতি-প্রতিবেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমি সকলকে আরও অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণের আহবান জানিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২২-এর সাফল্য ও সার্থকতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

ড. ফারহিন আহমেদ

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

সুস্থ্য-সুন্দর ও নির্মল প্রকৃতি-পরিবেশ সৃষ্টি করে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এধরণীকে বাসযোগ্য রাখতে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন ও জীবিকার জন্য বনের অবদান অনস্বীকার্য, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরুপ প্রভাব রোধ, বায়ুর গুনগত মান ও বায়ু মন্ডলের অক্সিজেন-কার্বন ডাই অক্সাইড ভারসাম্য রক্ষা করা, ভূমিক্ষয় রোধ, মরুময়তারোধসহ প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরণে বন অনাদিকাল থেকে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে বৃক্ষরোপণ অভিযানে রূপ দিয়েছেন- তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের বন ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও যুগোপযোগী হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র বনায়ন করে নতুন বনই সৃষ্টি করা হচ্ছে না, অবক্ষয়িত বনও পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। বন ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরের অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান, ২০২২-এর প্রতিপাদ্য "বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ" সামনে রেখে আমরা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। বন অধিদপ্তর দেশের বৈচিত্র্যময় বনাঞ্চলের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ এ বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপে এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে বিদ্যমান বনভূমির উপরে চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে বা সংকটাপন্ন হচ্ছে বহু মূল্যবান প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। বেড়ে যাচ্ছে ভূমির ক্ষয়। এ সব প্রেক্ষাপটে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বৃক্ষ সম্পদ সৃষ্টির জন্য বন অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বন অধিদপ্তর দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পতিত, প্রান্তিক ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমিতে বনজ সম্পদ সৃষ্টি করে এ পর্যন্ত ৪১১ কোটি ৫২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯০১ টাকা উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সৃষ্টি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং বিভিন্ন বিকল্প কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটা এখন স্পষ্ট যে, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন। তাই এবারের বৃক্ষরোপণ অভিযান সার্থক করার জন্য সবাইকে ব্যাপক হারে চারা রোপণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম পথিকৃৎ যার শুভ সূচনা হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাত ধরে। উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট সবুজ বেষ্টনী দেশের আয়তন বৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। সমুদ্র ও নদী মোহনায় জেগে ওঠা চর স্থায়ীকরণ এবং সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করতে সমগ্র উপকূল জুড়ে নতুন জেগে ওঠা চরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক এ যাবৎ মোট প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮ শত ৩০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বৃক্ষরোপণ অভিযানকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই বনায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই পতিত ও আশপাশের অব্যবহৃত খালি জায়গায় সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উৎপাদন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। আসুন আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চারা সংগ্রহ করি, গাছ লাগাই ও পরিচর্যা করি। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় অংশ নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ্য-সুন্দর ও টেকসই পৃথিবী গড়ি।

এ বছর যারা ''বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৯ ও ২০২০''; ''বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০২০ ও ২০২১''; এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়েছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের

শুভেচ্ছা

সাবের হোসেন চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ শাহাব উদ্দিন
সদস্য

হাবিবুন নাহার
সদস্য

আনোয়ার হোসেন
সদস্য

মোঃ শাহীন চাকলাদার
সদস্য

তানভীর শাকিল জয়
সদস্য

মোঃ রেজাউল করিম বাবলু
সদস্য

নাজিম উদ্দিন আহমেদ
সদস্য

জাফর আলম
সদস্য

খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন
সদস্য

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের জাতীয় বৃক্ষমেলা উদ্বোধন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৯ প্রদান করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সালে গণভবনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীর হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন

স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে টেকসই বন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ - শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২১

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রধান বন সংরক্ষক কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

জাতীয় শোক দিবসে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বন ভবন প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ

জাতীয় শোক দিবসে বন ভবনে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও প্রধান বন সংরক্ষকের শ্রদ্ধা নিবেদন

আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২২ এ সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীর চেক প্রদান

বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২০

"বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ"

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেম বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীতে একটি অতি সমৃদ্ধ দেশ। বিপুল সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণ বৈচিত্রের সমৃদ্ধতাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে এ দেশের জলাভূমি। "বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর শুরু হতে যাচ্ছে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য উন্নত প্রজাতি ও আধুনিক প্রযুক্তি জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে জাতীয় বৃক্ষমেলাসহ সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণ বৃক্ষমেলা হতে উন্নত এবং জলবায়ু ও পরিবেশ বান্ধব চারা সংগ্রহ করে রোপণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সমৃদ্ধকরণে অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুস্থ্য সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সময়ের পরিক্রমায় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, কাজের প্রকৃতিতেও যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিকতা। ২০১১ সনে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮ ক অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। অতীতের বন ব্যবস্থাপনা থেকে বর্তমান বন ব্যবস্থাপনা অনেকটাই ভিন্ন। বর্তমান বন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কাঠ উৎপাদনের পাশাপাশি নির্মল বায়ু, পরিচ্ছন্ন পানি, বন্যপ্রাণির জন্য স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল এবং প্রকৃতি-পর্যটন ও জীববৈচিত্র্যের আধার হিসাবে বনকে প্রতিষ্ঠিত করা। বন ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারনা হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা করা,যাতে করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেন জনসাধারণ বনায়ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে এবং ভাবতে পারে যে বনের বৃক্ষ রোপণ ও বড় করার পেছনে তাদেরও অবদান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বনের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়। এখন উৎপাদনশীল বন ব্যবস্থাপনা থেকে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে গুরত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বন ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু নতুন ধারণা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, যেমন- কৃষি বনায়ন, বসতবাড়ি বনায়ন, রাস্তার ধারে বনায়ন, জবরদখলকৃত জমিতে অংশগ্রহণমূলক বনায়ন, উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে ম্যানগ্রোভ বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বনভূমির অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা।

সম্প্রতি COP-26 এ বিশ্বের বনখাতের গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার লক্ষ্যে Glasgow Leader's Declaration on Forests & Landuse এর মাধ্যমে বিশ্বের ১৪১ টি দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশও একাত্বতা ঘোষণা করে। ঘোষণায় ২০৩০ সালের মধ্যে সম্মিলিতভাবে বন উজাড় ও ভূমিক্ষয় বন্ধ করতে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ বনখাতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে বন্ধে অংগীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ বনখাতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) কমানোর জন্য এবারই প্রথম Nationaly Determined Contribution (NDC) তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও সরকার বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণ ও বন খাতের গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) কমানোর জন্য Bangladesh National REDD+ Strategy ও REDD+ ব্যবস্থাপনা কাঠামোসমূহের গঠন অনুমোদন করেছে। বিভিন্ন টার্গেট সুমুহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় বন খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় সম্ভাব্য অর্জন সমূহকে সরকারের পক্ষ থেকে contribution হিসেবে United Nations Forum on Forest (UNFF) এ voluntary national contribution (VNC) হিসেবে দাখিল করা হয়েছে।

বন জরিপের ফলাফল ২০১৯ অনুযায়ী, সুন্দরবনের কার্বন মজুদ ২০০৯ সালের ১০৬ মিলিয়ন টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১৩৯ মিলিয়ন টন হয়েছে, যা সুন্দরবনের মোট কার্বন মজুদের ৩১%। ২০১৬-২০১৯ সালের বৃক্ষ জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে বন ও বৃক্ষের মোট কার্বন মজুদের পরিমাণ ১২৭৬ মিলিয়ন টন। বর্তমানে পরবর্তী বন জরিপ পরিকল্পনাধীন আছে যার উপর ভিত্তি করে বন খাতের নিঃসরণ কমানোর দিক নির্দেশনা সমূহ পুনঃমূল্যায়ন করা হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে বনের জবরদখল উচ্ছেদ, বৃক্ষহীন ও অবক্ষয়িত বনভূমি, প্রান্তিকভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় সর্বমোট ১,৬৩,৩৭৮ হেক্টর ব্লক, ২৬,৪৫৩ সিডলিং কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণের ১০৫৯.০০ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে সারাদেশে বৃক্ষ ও বনের আচ্ছাদন বৃদ্ধি, ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের জন্য পুনঃবনায়ন এবং বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার ২২০ হেক্টর সমতল ভূমি ও শাল বন পুনরুদ্ধার, ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৮০ হেক্টর পাহাড়ী বন পুনরুদ্ধার, ৫০০ হেক্টর আগর বন, ১৫ হাজার কি.মি. স্ট্রীপ বাগান, ৫০ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ২ হাজার ৭০০ হেক্টর এনরিচমেন্টসহ অন্যান্য বাগান সৃজন করা হবে।

উপকূলীয় চরাঞ্চলে বনায়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অগ্রণী দেশ। বন বিভাগ গত শতকের ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠা সহ দৃঢ়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও অভিযোজনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সমুদ্র ও নদী মোহনায় জেগে ওঠা চর স্থায়ীকরণ এবং সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করতে সমগ্র উপকূল জুড়ে নতুন জেগে ওঠা চরে বন অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৬৬ সাল হতে এ যাবৎ মোট প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮ শত ৩০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণির অভয়াশ্রম ও মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

দেশের কাঠের চাহিদার বেশির ভাগটাই গ্রামাঞ্চলের বন থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে। দেশব্যাপী বৃক্ষের পরিমান বৃদ্ধির জন্য সরকার তথা বন অধিদপ্তর সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সহ সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী ও আসবাবপত্র চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমান বৃদ্ধি। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ ও অ-কাঠ (non-wood) সম্পদ সৃষ্টি, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও বনজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৃক্ষরোপণে সরকার কর্তৃক জনগনকে উৎসাহ প্রদানে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী তথা মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৬ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দেশে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর বৃক্ষমেলাসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে। এছাড়াও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বিকল্প জীবিকা

কার্যক্রম ও জীবন-মানের উন্নয়নে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (Collaborative Forest Management) কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনাঞ্চল সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে, ফলে বন ও বন্যপ্রাণি রক্ষা পাবে।

প্রকৃতি ও প্রতিবেশ রক্ষায় Sustanable Forests and Livelihood বা সুফল প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বনায়ন সাইটে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Site specific plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। ৫৩৭২০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সহ অবক্ষয়িত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমি সমতল ভূমি এবং পাহাড়ী বনগুলিতে সহায়তামূলক প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম/সমৃদ্ধি/মিশ্র, ঔষধি, পশুখাদ্য এবং অ-কাঠ বনজ দ্রব্যের বনায়নের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধীনে বন ও বন্যপ্রাণির আবাসস্থল পুনরুদ্ধারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক ঝড়ের বিরুদ্ধে বাঁধা হিসাবে গ্রীন বেল্ট তৈরি করতে বনায়ন দ্বারা আচ্ছাদিত উপকূলীয় ২৪৮৮০ হেক্টর বাগান করা হয়। ২০টি রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল পুনরুদ্ধারে ২৫০০ হেক্টর এবং পশুখাদ্য ও খাদ্য বহনকারী বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ১৩৩০ হেক্টর বন্যপ্রানী করিডোর উন্নত করার কার্যক্রম গ্রহণ করাহ হয়েছে। ০৮টি বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ৩২টি সুরক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী এবং PA ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উন্নত করা হয়েছে। উদ্ভিদের লাল তালিকা (রেডলিস্ট) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। দেশে পাখি শুমারি করা হয় এবং শিকারী পাখি সংরক্ষণ বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হাঙ্গর এবং রে সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি সংরক্ষণ কৌশল এবং অ-ক্ষতিকর ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুমোদিত হাতি সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষ ও হাতির সংঘাত কমাতে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্যপ্রাণী এবং সুরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য ছয়টি সুরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য একটি উদ্ভাবন উইন্ডো তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়া Watershed Co-management Activity in Chittagong Hill Tracts (SID-CHT) প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য অঞ্চলে ৪৪৪৫ হেক্টর এনরিচমেন্ট প্লান্টেশন করা হয়েছে এবং পাহাড়ী এলাকায় জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ১০,৫০,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ছড়া ও ঝর্ণা রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সকল কার্যক্রমই প্রকৃতি-প্রতিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে যা জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার দশকের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

COLLABORATIVE FOREST MANAGEMENT- SUFAL PROJECT ANTICIPATES SUCCESS STORIES FOR BANGLADESH FOREST DEPARTMENT

Gobinda Roy
Project Director
Sustainable Forests and Livelihood (SUFAL) Project
and
Dr. Mohammad Zahirul Haque
Deputy Project Director
SUFAL Project, Forest Directorate, Ban Bhaban, Agargaon, Dhaka

Introduction: A collaborative approach is often deployed as a rational response to a crisis in forest management and constitutes an acceptance that, under current arrangements, sustainable forest management is unworkable. Particularly in the case of large, public forest resources, where disaffection or conflict between government forest services and local communities has become the norm, collaboration is seen as a way out of stalemate. In these circumstances, the rationale for governments to collaborate can be to address the social injustices that undermine sustainable forest management. Governments also collaborate in order to tap into the strengths of other partners, to share the responsibilities of forest management and to reduce costs. Communities living nearby have intimate knowledge of the forest, are able to monitor and police access, and respond rapidly to threats such as wildfires. NGOs can be skilled providers of social science expertise, such as training, facilitation and social surveys. The private sector brings investment and links to markets. By renegotiating responsibilities for forest management, forest service often hopes to reduce staffing levels, share the responsibility for protection with communities and concentrate on strategic planning, consensus building, regulation, monitoring and compliance (Carter et al, 2005).

Collaborative Forest Management Practice in Various Countries: Across the middle hills of Nepal, forests form a critical element of subsistence farming systems. In 1978 the government passed legislation enabling forests on public land to be handed over to local communities. Community forestry in Nepal has since evolved into a system whereby the users of a given forest area form a forest user group, represented by an elected committee, and take legal responsibility for managing the forest according to an agreed operational plan (Branney et al, 2001).

In the mid of 1990s, Madagascar began introducing a collaborative approach to forest management, under which communities are expected to take responsibility for managing local forests. The Tapia (Uapaca bojeri) forests endemic to the highlands of Madagascar, were increasingly under threat of overexploitation and recognizing this threat and the practical impossibility of protecting the forests by police-style patrols, the Forest Service took the decision to develop a participatory sustainable approach to forest management through working with the Swiss-supported support programme for forestry and small farmer development (Jean& Jurg 2004)

In Portugal Although modernization of agriculture has led to a decline in many of the traditional values associated with the Baldios, or forested commons, they still serve many useful functions, including provision of timber and resin. In 1976 the government passed a law to restore the commons to the original community users. At the time, commoners' assemblies elected five member councils to oversee management of their commons. Most (84%) of the councils elected to manage their commons in collaboration with the state. Since 1976, with the decline in the number of families involved in farming, many of the councils have been dissolved. Some 130 were still operational in 2000. Communities managing forested Baldios now organize auctions, negotiate with concessionaires, traders and the forest service and invest the revenues they receive from timber and resin for the benefit of the community (Jeanrenaud, S. 2001)

Much of Mexico's forest resource stands on community land. Communities (ejidos) received ownership rights to these lands after the 1910 revolution. In practice, however, the government controlled the forest resources and granted logging concessions to the forest industry, while community members received little benefit beyond opportunities for paid labor (Richards E.M. 1993).

With the history and experiences of more than one hundred years in formulation and revisions since the British colonial period, the forest policy of Bangladesh has turned away from a traditional production premises towards protection. Establishing protected areas for biodiversity conservation dates back to the1960s. The strategy gained impetus with the passage of national legislation in 1973 that included the provision of declaring forests as national parks, wildlife sanctuaries and game reserves for the protection of the natural forest resources. Due to the absence of a clear demarcation between core areas and buffer zones and the absence of concern for the sustention of local communities' usufruct rights, degradation continued in the protected areas. Therefore, an alternative strategy of co-management involving local stakeholders and provision of incentives in terms of Alternative Income Generation (AIG) supports has been introduced by the government under a donor assisted project. The evolutionary history of and periodical changes in the forest policy of Bangladesh highlighted the conservation aspects, the development of protected areas and the gradual adoption of their collaborative management. Social forestry, was introduced in Bangladesh in early 1980s and has proved to be extremely successful. While traditional forest management resulted in a net loss of forest resource cover, social forestry on the other hand, has been playing a vital role in the expansion of forest cover (40,387 ha of new forest cover and 48,420 km new strip plantation since the mid-1980s) benefiting thousands of poor people. Results show that during 2000-2003 more than 23,000 individuals benefited from the final felling of different social forestry plantations (woodlot, agroforestry and strip plantation).

Rationale for introduction of SUFAL Project

Although Bangladesh has traditionally been an agricultural country, growth of industries is continuing at a satisfactory pace and the contribution of both industrial and service sector has acceded the contribution of agriculture in the gross national GDP. Bangladesh has a notified forest area of nearly 1.9 million ha. including over 400000 ha of land expected to accrete from the sea in the near future. Out of the remaining 1.5million ha. of forest land, only about of half of the area is under natural forest, mostly in the Sundarbans, while the rest is under different types

of plantations (3,34,093 ha on record in 2013). Establishment of plantations mainly with teak, was started in the hill forest of the country almost 150 years ago. Forest areas of the country are mainly concentrated in the south-western (Sundarbans), eastern and north-eastern regions (hill forests) of the country, small patches of Sal (Shorea robusta) forest in the central and north western regions. Natural forests of the country are on a sharp declining trend due to pressure from illicit felling, encroachments, shifting cultivation and official conversion to other land uses. There is another area of 6,95,000 hectares mostly denuded of unclassed state forest (USF) which is administered by civil administrations in the Chittagong Hill Tracts.

Over last few decades, there has been a major decline in the area under tree cover. Global Forest Resources Assessment (GFRA) shows significant deforestation in the country, especially in the hilly region. According to a study recently conducted by the University of Maryland, USA and the BFD, the actual gross tree cover loss mostly was found within hill forests, contributing 56.5% to the total loss. Hill forests have low tree recovery rate and small tree gain area. As a result, hill forests experienced net tree cover loss of 80.8 thousand ha.

Again, the biodiversity of the country is under serious threats from anthropogenic pressures. As per IUCN (2016), out of 1619 assessed species, 2% are Regionally Extinct (RE), 3% are Critically Endangered (CR), 11% are Endangered (EN), 9% are Vulnerable (VU) and 6% are Near Threatened (NT). 31 species are categorized as extinct from the country, while 390 species (29% of the total species assessed) are under the threatened categories (CR, EN and VU).

Map Showing the districts of SUFAL Project Area

Therefore, aiming at restoring denuded and degraded forest sites, rehabilitate protected areas, establish plantations on newly accreted char land, promote, all undertaken through a collaborate forest management arrangement with forest dependent communities and support establishment of additional tree cover in areas outside forests, create alternative income generating activities for forest dependent communities; Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) project had launched in 2018 for five years and has been implementing in 28 districts and in 169 Upazillas. The districts are- Dhaka, Gazipur, Tangail, Faridpur, Gopalganj, Chittagong, Cox's Bazar, Noakhali, Laxmipur, Mymensingh, Sherpur, Jamalpur, Netrokona, Kishoreganj, Sylhet, Sunamganj, Moulvibazar, Hobiganj, Jessore, Dinajpur, Thakurgaon, Panchagar, Rajshahi, Naogaon, Barisal, Bhola Patuakhali and Borguna.

Objectives of SUFAL Project in context to Collaborative Forest Management

The overall objective of the SUFAL project is to improve collaborative forest management and increase access to alternative income generation activities for forest dependent communities in the targeted sites. This has been achieving by improving public sector management of forest resources and increasing participation of communities in forest conservation and

restoration and reducing direct dependence and exploitation of forest resources by offering alternative livelihood sources to dependent communities and improving the enabling environment for trees outside forests. Together, these will result in the eventual improvement of forest cover and ecosystem functions, coastline protection and increase employment opportunities for some of the poorest and most vulnerable communities, including women and small ethnic communities.

There are some Specific Objectives of the project as given below:

- To strengthen collaborative forests and Protected Area management for enhancing forest restoration, wildlife protection, biodiversity conservation and ecosystem services
- To increase access to alternative income generating activities AIGAs including forest extension service and planting trees outside forests areas to reduce forest exploitation and improving environment.

Collaborative Forest and Protected Area Management activities in SUFAL Project

Institutionalizing collaborative Forest Management (CFM): The aim of the collaborative forest management is to give forest dependent communities a stake in the management and preservation of the quality of the forests over the long term and to foster local stewardship forests. The BFD's approach to community involvement in the degraded and denuded forest land through social forestry has been in implementation for over two decades. The social forestry rules while providing clear guidance on benefit sharing under this approach, have largely encouraged monoculture plantation of non-native species and have had less influence on improving the quality and stocking of natural forests. A more comprehensive systematic approach is essential for BFD to work closely with communities to protect the remaining standing forests.

Relevant key activities for this component are to identifying policy and regulatory measures to strengthening collaboration with communities in different ecosystems; ii) identifying the most forest dependent communities where the project forms collaborative forest management communities (CFMCs); iii) awareness rising, capacity development and training on the CFM approach for the committees and BFD staff. Iv) Strengthening CFMC with own bank account, an operating fund and v) developing and institutional framework and rules for CFMC during implementation.

While dealing with communities for collaborative forest management, social safeguard policy of the World Bank are applied where necessary.

NGO involvement: Project hires 7 NGOs of high reputation for increasing access to alternative income generation activities (AIGAs) for collaborative forest and PA management, extension services and ToF. Two NGOs are selected for coastal region, two NGOs are selected for plain land Sal Forest region and 3 NGOs will be selected for hill region. These NGOs have been engaged in Group formation of 40000 community members and collect their data and provide data entry, organize capacity building training etc. for livelihood support and increase access to AIGAs. Each of the 7 NGOs will carry out a detailed baseline and database of community profile for future monitoring of project success. The project has engaged seven community

mobilization officers (CMO) who closely work with 7 NGOs in the implementation of project activities and reporting to the PD through concerned DPD. The project earmarked unallocated fund of US$9.0 million that will be used for establishing self-sustained institutional arrangement so that CFM institutions can run after phase out of the project. Unallocated fund of US$9.0 million may also be used in arrangement of logistics for staff mobilities of plantation supervision works. The project has been empowering communities to form 600 local institutions which will be operated for the collaborative forest and PA management. The project will initiate to register all these local institutions (CFMC) for their sustainability and legal protection. Necessary Community Operational Manual (COM) has been developed by engaging a community development specialist. The project is to review the implementation of existing PA management rules.

The formation of CFMCs: The formation of CFMCs has been facilitated by the NGO partners in consultation with the BFD Range and beat staff. The NGOs have been providing the capacity building support and CFMCs will be the main platform for activities of CFM. Village level collaborative forest management committee (CFMCs) are going to be formed with membership being open to all households in the nearby village. A total of 600 villages surrounding 338 Beats have been selected to form CFMCs. Such committees will be formed initially in the project intervention areas and will be expanded other areas as BFD and communities gain experience. The CFMCs are to participate in the preparation of the site-specific plan (SSPs) for the forest area to be treated under the project. The collaborative forest management committee (CFMC) are designed to be formed by the following members, namely:

- President- Elected from the forest dependent communities
- Member- Union Parsishad Member (2 in number, one will be female and nominated by concerned Union Parishad Chairman)
- Member- Representative from Forest Dependent community (Minimum 20% representation by female) (each targeted village will select two or more (if needed) members as representative (Total representatives minimum 11 persons)
- Member Secretary- Concerned Forest Beat officer.

ToR of the CFMC: Arrange and establishing plantation and protection of the forest by the community Committee will help to define species selection (Only indigenous forest species may be selected by community) during SSP exercise Term for the CFMC will be for 2 years SSP preparation will be carried out broadly along the following steps:

- RIMs unit in BFD will create and deliver an SSP information pack per beat. This will include-
  - Hardcopy map (including satellite imagery as underlay) showing the outline of each potential activity block
  - Detail of 2017 CEGIS report of site visits and Photograph per Beat (if available)
  - SSP field forms in hardcopy or via an Open Data Kit (ODK) electronic field form. The content and format of these forms will be developed by engaging a short-term consultant who will consult BFD staffs and local communities and present it to RIMS unit for taking necessary measures for BFD approval. A template/protocol will be developed by the consultant and will be used in the field for carry out SSP exercise and develop plans.

- Local beat and Range office staff will subdivide the block, as necessary into individual parts by drawing each part on the paper map
- For each part that is drawn on the map, a form will be filled. The form will help the field staff record the current status of the site and existing vegetation, the planned field activities, timing and species selection etc.
- The finished maps will be photographed and forwarded to RIMS by the end each working day. All the documents will be forwarded to a central database. Field staff will use Smartphones for this purpose.
- RIMS will digitize the incoming data and store it.

Strengthening of the PA management System: The project will finance conservation, Community Co management Committee (CMCs), capacity development and ecotourism activities in the selected PAs. Annual work plans will be developed for each of the selected PAs with active participation of CMCs and financed by the project, following their approval by the BFD. Conservation approaches through communities will be scaled up by forming new CMCs in the same five Pas where the new management plans are being developed and where no CMCs have yet been formed.

Community Mobilization and Organization: This sub-component will comprise of the following activities: i) mobilization of communities with CFM committees in the forest depended villages and socializing the SUFAL project and the AIGA program. Ii) establishing and/or strengthening CFMC bank account and starting community savings. iii) initiating village development activities through village development fund. Iv) training on livelihood diversification, preparation of livelihood proposals, accounts and book keeping. An important aspect will be organizing and training women and adolescent girls and offering them training and choice of income generation options.

Alternative income generation activities (AIGAs): A community operations Manual (COM) will be prepared prior to start of the project implementation in consultation with communities, taking into account experiences of CRPAR project and similar on-going operations in the country. The COM will elaborate the protocols for the implementation of the AIGAs.

Criteria for selection of AIGAs funds recipients: The livelihood funds will be maintained as a revolving fund at the community level and will be available to community members as micro credit. Priority for access to AIGA funds are planned to be given to members of CFMCs who are a) among the poorest in the village, b) women-headed households c) landless and lack of year-round employment, or d) belong to ethnic minority communities.

Consultation meeting among community member

Funding of AIGAs: The NGO partner will provide training and information to the communities on potential income generation options. Each household or group of households wiling of eligible to access the fund will prepare a proposal for the activity of their choice, with the assistance of the NGO partner. The AIGA fund will be managed by a CFM sub-committee comprising of members eligible to borrow for AIGAs. AIGA plan approvals will be made by the AIGA sub-committee in consultation with the NGO team. Each household or group with an approved AIGA plan will be able to access the fund, with an agreed repayment schedule. The book keeping and management of inflows and outflows from the AIGA funds will be the responsibility of the AIGA sub-committee.

SUFAL Project competes of four components, among those, component 2 and 3 are concerned with collaborative Forest and Protected Area Management.

Component 2: Strengthening collaborative Forest and Protected Area Management

Main interventions are as follows:

- 52,720 ha. of degraded and denuded forest lands including wildlife habitat are restored in the plain land and hill forests through ANR/Enrichment/mixed, medicinal, fodder and NTFP plantations under collaborative forest management approach.
- 24,880 ha. accreted coastal areas covered by afforestation to create a belt of trees as a barrier against seaborne storms.
- 2500 ha. wildlife habitat in 20 PAs and 1330 ha corridor are improved through fodder and food bearing tree plantation that helps wildlife conservation.
- Wildlife and PA management activities enhanced in 32 PAs.
- Smart patrolling is introduced in selected PAs.
- Site specific plans are prepared for each of the plantation sites.

Component 3: Increasing Access to Alternative Income Generating Activities (AIGAs), Forest Extension Service & Trees outside Forests (ToF)

Main interventions are as follows:

- US$20.0 million disbursed to create village (community) development fund by involving 40000 forest and PA dependent communities from villages around 330-338 beats including five selected Pas.
- 600 CFMCs formed for collaborative forest and PA management and institutionalized through forming different sub communities (Sub-committees: procurement, accounting, social auditing and purchase and monitoring etc.) and Co-management Committees (CMCs)
- 600 CFMC bank account created and operated by 600 CFMCs
- Five new CMCs formed and supported AIGA opportunities
- 10800 members of the collaborative forest management institutions are capacitated by offering training on community operation manual
- SUFAL project will sequester about 33 million tons of Carbon in 40 years, making SUFAL as a major carbon sequestration project for Bangladesh and the world bank.

- 63.5 lakhs seedlings including 7.5 lac improved propagules are sold/distributed in the trees outside forest areas to enhance tree cover in the country.
- 3460km of strip plantation established.
- 7 NGOs engaged for community organization, database entry and AGIA activities of the communities.

Progress of CFM Activities

A. 7 NGOs of high reputation for increasing access to alternative income generation activities (AIGAs) for collaborative forest and PA management, extension services and ToF have been hired as prescribed in DPP as follows:

- Nature Conservation Management (NACOM) for Hill Cox's Bazar North and South
- Swabalambi Samaj Unnayan Sangstha (SSUS) for Chattogram and Noakhali Coastal Forest Division
- Center for Natural Resources Studies (CNRS) for Hill Sylhet
- Dhaka Ahsania Mission (DAM) for Chittagong North, South and Wildlife Division
- Eco-Social Development Organization (ESDO) for Plainland Mymensingh
- Eco-Social Development Organization (ESDO) for Plainland Dhaka and Tangail
- Proshika Manobik Unnayan Kendra for Coastal Bhola and Coastal Patuakhali

All the NGOs have already submitted Inception report that included

- Work plan
- Assessment of the project objectives
- Problem encountered
- Organogram of the project team and project management structure

Social Mapping meeting at FCV

Two NGOs have already submitted 1st progress report that covered progress of FCVs, baseline survey data, selection methodology of FCVs and scale up of CMC, Community Profiling through data entry etc. as follows:

Center for Natural Resources Studies (CNRS)

SL	Activities	Total Project Target	Achievement up to this deliverable	Target for (this deliverable)	Achievement (this deliverable)	Total Achievement	Balance
1.	Inception meeting /workshop	1 No.	-	-	-	-	
2.	Staff Orientation	1 No.	1	1	1	1	1
3.	Beat Selection (Number of beat finalized by DFO Sylhet	39 No.	39	39	39	39	0
4.	Selection of FCV/ VCF	86 No.	86	86	86	86	
5.	FCV General Meeting	86 No.	86	86	86	86	
6.	CIP team formation	86 No.	86	86	86	86	
7.	CIP training	86 No.	86	86	86	86	
8.	CIP Process:						
8.1	Transect Walk	86	86	86	86	86	
8.2	Resources Map	86	86	86	86	86	
8.3	Well-being analysis	86	86	86	86	86	
8.4	HH data collection of selected villages	86	86	86	86	86	
8.5	Draft CIP list	86	86	86	86	86	
8.6	Documentation	86	86	86	86	86	
9.	Beneficiary selection for AIGAs	5730	5730				
10.	Beneficiary approved by the FCV and DFO	5730	5730	-	-	-	-
11.	Prepare list for AIGAs members and consultation with the community	5730	5730	-	-	-	-
12.	CFMC/ VCF/ FCV-EC formation	86	-	-	-	-	-
13.	Meeting with CMCs	0	4	4	4	4	0
14.	Data entry and prepare database of AIGA	5730					
15.	Sub-committee formation			430	430	430	
16.	Regular consultation with FD officials & CMO	-					
17.	Inception Report Submission	1	1	-	-	1	0
18.	Progress report, deliverables	6	1	1	1	1	5

Proshika Manobik Unnayan Kendra

SL	Activities	Total	Patuakhali FCVs	Patuakhali CMCs	Bhola FCVs
1.	Inception meeting /workshop				
2.	Staff Orientation				
3.	Beat Selection (Number of beats finalized by DFO	30	16	2	12
4.	Selection of FCV/ VCF	60	20	11	29
5.	FCV General Meeting				
6.	CIP team form ation	60	20	11	29
7.	CIP training	15	7		8
8.	Data entry Information from KOBO collect	4000	1225	1000	1775
9.	Beneficiary selection for AIGAs	4000	1225	1000	1775
10.	Beneficiary approved by the FCV and DFO	4000	1225	1000	1775
11.	CFMC/ VCF/ FCV-EC formation	60	20	11	29
12.	Forest Protection and Conservation Committee (FPCC) Formation	60	20	11	29
13.	Village Credit and Savings Committee (VCSC)	60	20	11	29
14.	COM Implementation	60	20	11	29
15.	Supervising LDF and CDF activities	60	20	11	29
16.	Inception Report Submission	1	-	-	-
17.	Progress report, deliverables	1	-	-	-

B. Site specific planning (SSP)

- 59,049 ha SSP completed and after screening is underway using Dashboard. After initial screening 48,883 ha plantation areas were finalized.
- 200 black view Smart phone and 200 GPS are in operation.
- 656 frontline BFD participants trained.
- 324 Index maps for forest beats developed and uploaded in the dashboard.

Preparing SSP

Restoration of Degraded and Denuded Forests, Coastal Greenbelt and Field infrastructure - Site specific planning (SSP) accomplished (post screening data)

Forest Divisions	Nursery year				
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total
Chattogram North Forest Division	477	976	1,084	965	3,502
Chattogram Sou th Forest Division	875	955	765	1,920	4,515
Coastal Forest Division, Bhola	100	575	750	925	2,350
Coastal Forest Division, Patuakhali	100	1,258	1,375	2,010	4,743
Costal Forest Division Chattogram	265	1,330	1,645	1,492	4,732
Costal Forest Division, Noakhali		1,625	2,570	3,750	7,945
Cox's Bazar North Forest Division	1,187	895	805	689	3,576
Cox's Bazar South Forest Division	1,882	2,134	1,720	1,735	7,471
Dhaka Forest Division	7	568	755		1,330
Mymensingh Forest Division	1,024	600	371		1,995
Social Forest Division, Dinajpur	285				285
Sylhet Forest Division	770	1,198	883	45	2,896
Tangail Forest Division	550	685	418		1,653
WMNCD, Ctg	540	825	210		1,575
WMNCD, Dhaka		11	35		46
WMNCD, Moulabi Bazar		100	170		270
Grand Total	8,062	13,735	13,556	13,531	48,883

Nursery raised under SUFAL Project at Tangail Forest Division

C. Restoration of Degraded and Denuded Forests, Coastal Greenbelt and Field infrastructure Year-wise Plantation Progress

Plantation Types	DPP target	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Balance
Reforestation Hill Forests (ha)	54,890	1,239	13,748	13,791	13,362	11,300
Reforestation Sal Forests (ha)	1,630	-	582	409	600	40
Reforestation Mangroves (ha)	21,080	100	3,300	6,320	6,685	10,028
Golpata Plantation (SKM)	1,330	100	520	650	60	-
Strip Plantation (SKM)	3,460	175	1,321	895	1,069	400
Seedling dis tribution (lac)	63.50	3.73	48.69	2.10	1.49	6.80

Plantation with fast growing indigenous species at Cox's Bazar South Forest Division

Conclusion: Sustainability of the project benefits has been taken into account right from the project appraisal phase. It is expected that the collaborative forest and PA management will sustain even after the project completion. Forest restoration program has been accomplishing under collaborative forest management approach. A total of 52,720 ha. of degraded and denuded forestland and wildlife habitat will be restored and 24,880 ha. of coastal land will be afforested and thus improve tree cover and enhance ecosystem services. This will enhance sustainability of forest product supply and help sustain forest dependent economic activities. All the forest dependent communities will be motivated for conservation of forests, wildlife and

biodiversity. At least 40000 households of forest and PA dependent communities will be brought out of poverty level and thus will minimize pressure on forests. Finally, vision of conservation of forests, environment and biodiversity and socio-economic development through modern technology and innovation will be explored successfully.

Acknowledgements: The authors thank Mr. Md. Abdullah Abraham Hussain, Deputy Conservator of Forests & DPD, SUFAL Project and Mr. Md. Mehdee Hasan Khan APD, SUFAL Project and Mr. Md. Ruhul Muhaimen and Dr. Md. Abdul Motaleb consultants, SUFAL Project for providing information and all sorts of cooperation for formation of the write-up.

References:

1. Jane Carter & Jane Gronow, 2005 Inter-cooperation, PO Box 6724, CH-3001 Bern, Switzerland E-mails: janecarter@intercooperation.org.in and jane.gronow@virgin.net
2. Branney, P., Malla, Y.B., Bhattarai, B., Tamrakar, P.R. and Neupane, H.R. 2001 Innovative forestry: a synthesis of smallscale forest management practice from Nepal. A field worker's guidebook for supporting community forest management. Recent Experience in Collaborative Forest Management: A Review Paper 45 ODI, London, UK. http://www.odifpeg. org.uk/publications/greyliterature/Participatory%20forest%20management/innovative%20forestry/index.html.
3. Jean-Laurent Pfund and Jürg Brand, personal communication (2004)
4. Jeanrenaud, S. 2001. Communities and forest management in Western Europe: a regional profile of the working group on community involvement in forest management. IUCN The World Conservation Union. Gland, Switzerland. 150p.
5. Richards, E.M. 1993. Lessons from participatory natural forest management in Latin America: case studies from Honduras, Mexico and Peru. Journal of World Forest Resource Management 7(1): 1–25.
6. DPP of SUFAL Project

WATERSHED CO-MANAGEMENT INITIATIVE IN CHITTAGONG HILL TRACTS THROUGH SID-CHT PROJECT

Md. Moyeenuddin Khan
Deputy Chief Conservator of Forests, Education & Training Wing, BFD

Md. Oli Ul Haque
Deputy Conservator of Forests, Education & Training Wing, BFD

The Chittagong Hill Tracts is an important hilly area located in the southeast part of Bangladesh. The Chittagong Hill Tracts consists of three districts namely Khagrachhari, Bandarban and Rangamati. The area of the three hill districts of Chittagong Hill Tracts is 13,295 sq. km which is about 9% of the total area of the country. About 40% of the total forests of the country are located in this area. Rapid population growth in the CHT, poverty, new settlements, deforestation, dependence on forests for fuel, zoom cultivation, conversion of forest land to agricultural land for commercial cultivation of certain crops and fruits, high concentration of economically important plants and dense forest have been gradually degraded due to lack of management. To restore the forest and biodiversity as well as the watershed of the Hill Tracts, Bangladesh Forest Department has taken initiative to implement Watershed Co-Management Activity in the CHT through Strengthening Inclusive Development in Chittagong Hill Tracts (SID-CHT) project.

The hills, forests, wildlife, biodiversity of the Chittagong Hill Tracts are historically, culturally and financially linked with the valuable resources of Bangladesh and the livelihood of the small anthropological people living in the hilly areas. If the land in this hilly region is not protected through afforestation, it will reduce the flow of water for the people of the plains and will endanger the livelihood and uninterrupted flow of water for the people living in the hilly areas. Moreover, the erosion of organic matter-rich topsoil due to prolonged exposure will make the land in the area barren and the soil erosion will gradually increase. As a result, it will be difficult to make afforestation successful in future.

By conserving and restoring these valuable forests and forest resources in the Chittagong Hill Tracts, there is an opportunity for the local people to carry out joint afforestation on about 1 lakh 15 thousand hectares of degraded land in order to conserve the forest resources and biodiversity of the country. Initially, plans have been made to implement Integrated Watershed Management activities involving the local people in 5,000 hectares of degraded forest areas in Castalong, Sitapahar, Rainxiang, Sangu and Matamuhuri.

With this in mind, Watershed Co-management of the USAID-funded Strengthening Inclusive Development in Chittagong Hill Tracts (SID-CHT) project, funded by USAID, aims to increase the capacity of indigenous peoples to adopt climate change and restore degraded forest and to increase the tree cover in hill areas. Under this, the Forest Department is implementing Assisted Natural Regeneration (ANR) afforestation activities. The activities of Watershed Co-Management Activity Component under the project have been started in Rangamati and Bandarban district by the Forest Department from September 2017. These activities will be implemented till July 2023. Estimated cost of activities under the said component: US 2.237512 million.

As a result of participatory afforestation in the Chittagong Hill Tracts, the relationship of the local people with the Forest Department will be more cordial and mutual trust will increase which will help in the implementation of future afforestation activities in the hill areas; affforestation will increase forest cover; biodiversity will be enriched; wildlife habitat will be restored and enriched; the impact of climate change will be greatly reduced by increasing carbon reserves. In addition, many needs of the people of the area will be met, such as: - employment opportunities will be created resulting in the development of their socio-economic conditions; water scarcity for household use and cultivation during the dry season will be alleviated through natural springs, rhymes and rainwater conservation management; procurement of secondary and non-timber forest products; establishment of small and cottage industries and expansion of eco-tourism will increase their income.

Under the project "Strengthening Inclusive Development in Chittagong Hill Tracts (SID-CHT) financed by UNDP, Bangladesh Forest Department(BFD) is implementing the CHT Watershed Co-Management Activity (CHTWCA) Component at field level as well as building of the BFD field staff and local community to increase capacity of natural resources management(NRM) and Climate Change resilience. The main activities of the project are -

- The project organized 2 stakeholder's workshop (One in Rangamati and another in Bandarban),
- Identify suitable micro-watersheds with GPS coordinates and imagery mapping (5,000 ha.)
- Mapping for the Integrated watershed management plan(IWMP) and 3 PA management plans.
- Select 3,000 participants from neighboring community for group formation for Integrated Watershed Management (IWM),
- Provide training to the BFD official and field level staff (166 Nos. have already got training) and 42 more will get training in the current fiscal year.
- Organize training for local people (CPG, VCF, PF and others) regarding conservation awareness raising for control of illicit felling and forest fires, raising conservation awareness during National Tree Campaigns and the International Day of Forests, Environment and wetlands for promoting integrated ecosystem management, functions and services,
- Carry out site specific subsidiary silvicultural operations (Climber cutting, pruning, cleaning, weeding, fire control etc.) in the natural forests (1500 ha. has already been done and 1500 ha. is being done in the current fiscal year)
- Conduct Enrichment Planting (3445 ha. has already been done and 1000 ha. is being done in the current fiscal year) with subsidiary maintenance (vacancy filling, weeding, mulching, application of fertilizer etc.) of the plantations,
- Production and distribution of seedlings among the participants (2,50,000 nos already distributed, 4,00,000 nos is being distributed in the current fiscal year and 4,00,000 nos in the next fiscal year).
- Natural Streams/Choras and rainwater conservation measures (1300 ha. has already been done and 1200 ha. is being done in the current fiscal year)
- The project also aims at preparation of an Integrated REDD+ Sub National Plan for the hill region,
- Study on formulation and operationalisation of safe guard information system for REDD+ readiness
- Preparation of Management Plans for 3 Protected Areas (PAs) i.e. PWS (Pablakhali Wildlife Sanctuary), SWS (Sangu Wildlife Sanctuary) and KNP (Kaptai National Park).

The watershed co-management activities taken under the project SID-CHT is the pioneer initiatives from Bangladesh Government to conserve and restore the watersheds of the Chittagong Hill Tracts. It has opened the window for implementation of development programs in forestry sector in the CHTs with the hill people.

MAKING THE CASE FOR GREEN SPACES FOR URBAN SUSTAINABILITY: A FOCUS ON THE CITY OF DHAKA

Niaz Ahmed Khan, Ph.D.
Professor and former Chairman
Department of Development Studies, University of Dhaka;
Former Country Representative-Bangladesh, IUCN
and
Sultana Razia
Doctoral Researcher
Department of Social Administration and Justice, University of Malaya, Malaysia

The significance and implications of urban green space for wider sustainability of city environments are now unequivocally established among both the academic and practicing quarters. Green spaces are known as 'green lungs' of the city which help to provide mental and physical health among the people. Among other benefits, for example, green spaces in the urban areas can reduce noise pollution and improve air quality; and thus, contribute to overall urban sustainability.

Most cities in the developing countries typically face many challenges; for instance, air, water and noise pollution; lack of green field and space for physical exercise and relaxation; inefficient household waste management; unexpected onslaught of urban calamities - which forces city dwellers to undergo additional mental stress along with city life pressure. In this context, urban development and sustainability have become critical issues of concern for the city stakeholders – from regulators to city inhabitants. City authorities have prime responsibility to keep balance between urban development and sustainability for the present and future generation. The provision of adequate green spaces is considered as key element for ensuring urban sustainability. More specifically, green spaces provide walking, cycling, socializing opportunities that help to mitigate daily stress. Citizens get the social benefits of urban green space in terms of recreational opportunity, mental well-being, aesthetic enjoyment, and social bonding. Thus, urban green space is playing a vital role on social issues in the mega cities. Urban green space provides citizens economical, ecological and social equity benefits that turn the city into sustainable.

Generally, green spaces are not only used for ecological and environmental balance, but also social facts like balanced mental growth of city dwellers. Green space is a combination of garden, parks, green grounds, natural vegetation, roof top gardening, playing field, green corridors. Sustainability focuses on meeting the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Urban sustainability is essential where a city uses natural resources and release emissions and wastes.

Dhaka is one of the fastest expanding cities where more than 17 million people are living. The city has grown with wanton destruction of green cover, unexpected flooding, prolonged water

logging, and air pollution owing to imbalanced urbanization. The State of Global Air Report (2017) ranked Dhaka city the second most air polluted city in the world. Pollution and mismanagement have decayed the city's fabric of sustainability. The provision of green spaces can prevent this decay and improve the quality of urban dwelling.

Urban centers in developing countries are increasingly facing varied tangible and intangible effects of (often unplanned) urbanization process such as lack of balancing atmospheric oxygen, emission of carbon dioxide, lack of flood control, and lack of cleansing of return water flow, and physical and mental stress. As argued by urban sustainability is useful for urban inhabitants for two simple yet vital reasons: first, it provides quality of air, water and waste management; second, it creates environmental and ecological balance in the cities. Green space constitutes the key component for any urban sustainability.

There is no universally accepted definition of 'green space'; however, one popular view defines green space as those lands which include both cultivate land such as agricultural areas, crop fields, fallow lands and vegetation cover like deciduous forest, mixed forest lands, palms, conifers, shrubs, and others in the context of Bangladesh.

In one sense, the provision of green space is a human desire for getting the better urban ecosystems, sustainable development, environment quality and healthy life as well. The multifarious (including health, environmental, social and economic) benefits of urban greening are now proven, and extensively cited in the literature.

Despite the general recognition of the above features and benefits of green space and sustainability of the urban areas, the literature report on various problems and limitations. In many developing countries, for example, citizens' desire has been ignored by policy planners while deciding about the location, design and management aspects. Recent studies have explained that green spaces have been heavily compromised by such factors as the pollution arising out of poor management of the construction process, fallout from reckless energy consumption, and air pollution from unplanned incineration plant in the cities.

Notwithstanding this recognition and importance, however, academic research on the subject has been strikingly limited especially in the context of Bangladesh. The common public perception is that the current situation of green space in Dhaka city is not up to the mark for healthy living. The less provision of green areas than the standard has social implication on health, mental satisfaction, domestic violence, and socialization. It also affects urban sustainability.

As the preceding discussion on urban sustainability suggests that green space is essential element for the urban environment and has greater impact on life of city dwellers. Once upon a time, Dhaka city was famously dubbed as the 'Venice of the Orient' for its wide open spaces; but the scenario has changed over time. Situated on the bank of the Buriganga, Dhaka (formerly known as 'Dacca') cherishes a long history since its establishment in 1772. The city has experienced booming population over the years (see Table 1).

In the recent decades, Dhaka has been one of the fastest growing cities in the world. Approximately 17 million people live in the area of 350 square kilometers. The rapid urbanization coupled with the population boom have led to the gradual demolition of open space like parks,

Table 1: The population growth trend in the Dhaka city.		
Year	Population	Growth Rate (% per year)
1941	2,39,728	4.14
1951	4,11,279	1.28
1961	7,18,766	5.18
1974	20,68,353	9.32
1981	34,40,147	9.94
1991	71,24,730	7.55
2001	1,02,53,992	3.7
2011	1,51,23,293	3.96
Source: RAJUK (2016a)		

vacant lands and green areas, which created such undesired environmental reactions as noticeable rise in the surface temperature, excessive rains, acid rains, and extreme dust in the air. Urban green areas in Dhaka have rapidly shrunk in the recent decades and resultantly, citizens have been experiencing a stressful and unhealthy life; put differently, the scarcity of open or green space has made the city unsustainable to a great extent. Table 2 shows the gradual reduction of green space over the years between 1975 and 2017. The highest rate (i.e. 20.8%) of loss of green space in Dhaka occurred during the period 2000-2005. Modern Dhaka consists of two City Corporations (North and South) with 130 Wards. Currently, the Dhaka city has 54 registered parks and 11 playgrounds under the two City Corporations as opposed to the Dhaka City Structure Plan's suggested target of at least 20% green space of the total city area.

Table 2: Loss of green are as in Dhaka		
Year	Loss of Green area (hectares)	Rate of green loss (%)
1975	18,626	-
1988	14,818	20.4%
1999	12,966	12.5%
2005	10,009	22.8%
2012	8805	12.03%
2017	7768	11.78%
Sources: Byomkesh et al., (2012: 53) and Mundi (2018)		

Table 3 The major urban green spaces in Dhaka		
#	Name of the Open Space	Area (acre)
1	Sohrawardy Udyan	55
2	Ramna Park	58
3	North and South Plaza of National Assembly Building	95
4	Chandrima Udyan	77
5	National Parade Square	120
6	Botanical Garden	
Source: Khan (2014)		

The following table outlines the six major urban green spaces in Dhaka.

Although somewhat limited, there have been some policy and operational efforts by the government towards widening the green spaces in Dhaka. The RAJUK, for example, has initiated such pilot programmes as 'Compensative Greening' and 'Long-Term Greening'; the effectiveness of these initiatives have been limited mainly owing to insufficient monitoring. Besides, many illegal and unplanned structures posed a challenge while implementing the urban greening programmes. With the stated aims of reversing the trend and serving the purpose of visual relief and buffering from building, the Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP) has been developed which proposes creation of urban forestry, parks, playgrounds, domestic gardens, roadside open spaces and other forms of urban vegetation.

As noted above, there has been strikingly limited research on the subject, and this interesting area of study deserves immediate academic attention – as at present our knowledge on the subject is at best marginal.

[Acknowledgement: This article partially draws on the following paper and the literature cited therein: S.Razia and N.A.Khan. 'Residents' Perception of Green Spaces for Urban Sustainability: A Case Study in Dhaka City', Lok Proshashan Samoyiki, Vol.68, 2018: 1-21 (Bangladesh Public Administration Training Centre).]

উপকূলীয় বনায়নে বন অধিদপ্তরের সাফল্য

মোঃ মঈনুদ্দিন খান
উপ প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ খান
বন সংরক্ষক, কোস্টাল অঞ্চল, বরিশাল

পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দূর্যোগ প্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূমি ক্ষয় ইত্যাদি পরিবেশগত বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত জনগণ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় বঙ্গোসাগরের উপকূলে সৃষ্ট বন্যা বিধৌত একটি নিম্নাঞ্চলীয় দেশ। যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ বিগত বছরসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দূর্যোগসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে পৃথিবীতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে বঙ্গোসাগরে সাইক্লোনের মৌসুমে সাইক্লোনের প্রবণতা ও তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাসসহ সাইক্লোন এবং অতি বৃষ্টির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়ি বাঁধের ভিতরে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ছে এবং তা দীর্ঘ মেয়াদী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। ফলে কৃষি ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও লবন উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং গবেষণাকারীগণ জানাচ্ছেন ভবিষ্যতের দিনগুলোতে সাইক্লোন ও সুউচ্চ জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমি ভাঙ্গন, ভূমিক্ষয় এবং লবাণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনে ঝুঁকির প্রবণতা বেড়েছে। বিভিন্ন গবেষণা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমীক্ষায় ধারণা করা যায় যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের ১৫% সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে এবং প্রায় ১ কোটি লোক বাস্তুহারা হবে।

উপকূলীয় বনায়নের উদ্দেশ্য ঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই উপকূলীয় বনায়নের সূচনা হয়। উপকূলীয় জনসাধারণকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ ধরনের বনায়ন কার্যক্রম সাধারণতঃ সমুদ্র তীরবর্তী চর বা নতুন জেগে ওঠা দ্বীপে বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনে সারা বিশ্বে পথিকৃৎ (Pioneer)। ম্যানগ্রোভ বনায়ন প্রথম ১৯৬৫ সালে উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার (Polder) বা বাঁধের বাইরে সৃজন করা হয়। প্রধানতঃ উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠিকে সামদ্রিক বন্যা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে উপকূলীয় বনায়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ম্যানগ্রোভ বনায়নের আরো অনেক অতিরিক্ত সুফল পরিলক্ষিত হয়; যেমন- নতুন চর জেগে ওঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, ভূমির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি, নদী ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ কৃষি জমিতে লোনা পানির অনুপ্রবেশে বাঁধা দান ইত্যাদি।

উপকূলীয় বনায়নের উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে (ক) নতুন চর জেগে ওঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ এবং স্থায়ী করণ; (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী তৈরী ; (গ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি; (ঘ) আবাসস্থল এবং প্রজনন সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জীববৈচিত্র বৃদ্ধি। উল্লেখ্য নতুন জেগে ওঠা চরে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের ফলে চরের

স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিসহ এবং ভৌগোলিক সীমারেখা বৃদ্ধি পায় সার্বিক বিবেচনায় ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন প্রক্রিয়া চলমান রাখা একান্ত প্রয়োজন।

উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম ঃ

উপকূলীয় বনায়নের প্রায় ৯০% এলাকাতে কেওড়া বাগান আছে এবং অবশিষ্ট ১০% এলাকায় অন্যান্য প্রজাতির বাগান আছে। উপকূলীয় বনাঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহ হচ্ছে- কেওড়া (Sonneratia apetala), গোলপাতা (Nypa fruticans), বাইন (*Avicennia officinalis*), কাঁকড়া (*Bruguiera sexangula*), সাদা বাইন (*Avicennia alba*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), পশুর *(Xylocarpus mekongensis)* এবং এ ছাড়াও ধুন্দল, ঝনা, ক্রিপা, ছৈলা ইত্যাদি প্রজাতিও খুব স্বল্প পরিমাণে দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভ বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ :

উপকূলীয় অঞ্চলে সফল ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের জন্য পরিমিত তাপমাত্রা, শুষ্কতা, কাদাযুক্ত বালি মাটি/কাদা স্তর, লবণাক্ততা, জোয়ার ভাটা, সামুদ্রিক স্রোত, উপকূলের গভীরতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

উপকূলীয় বনায়ন মনিটরিং:

ম্যানগ্রোভ বনায়ন সফলতার চাবিকাঠি হলো যথাযথ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ। ম্যানগ্রোভ বাগান সফল করার জন্য নিয়মিত কিছু পর্যবেক্ষণ আবশ্যক-যেমন, চারার বেঁচে থাকার হার, বনায়নস্থলে পলি জমার হার, বনায়নস্থল ও তার চারপাশে ভূমি ক্ষয়, বালু সরে যাওয়ার হার, পলি অপসারণের হার, বর্জিতাংশ জমা, গোচারণের প্রবণতা, মানুষের ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ, অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের উপস্থিতি এবং আচ্ছাদন, পূনঃপূনঃ চারা রোপণ, চারার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত তথ্য সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

উপকূলীয় বনায়নের প্রধান অন্তরায়:

উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে এ অঞ্চলের মাটির স্থায়িত্বের ওপর। দ্রুত ভূমি গঠন, বালিতে ঢেকে যাওয়া, পলি সরে যাওয়া, জোয়ারের প্রকোপ ও ভূমিক্ষয় ইত্যাদি উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সর্বদা গতিশীল প্রকৃতির নদীজ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। উপকূলীয় বনায়ন সাফল্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্রুত ও অনিশ্চিত পরিবর্তন নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। সদ্যজাগ্রত দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলের বিদ্যমান সামগ্রিক পরিবেশ ঐ এলাকার জীববৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলে উপকূলীয় বনায়নে নিম্নবর্ণিত সমস্যা তৈরি করেছে ।

- পলি ও বায়ুবাহিত বালি দ্বারা সামগ্রিক অথবা আংশিকভাবে চারা ঢেকে যাওয়া।
- সদ্যসৃষ্ট বাগান থেকে পলি সরে যাওয়া।
- নদীনালা ও জোয়ারের খরস্রোতে বাগানের প্রান্তসীমার ক্ষয়সাধন ।
- *Sonneratia apetala*-এর এক-ফসলি বাগানে কান্ডভেদী পোকার *(Zeuzera conferta)* আক্রমণের ব্যাপকতা
- বৃক্ষাদির প্রাকৃতিক বংশবিস্তারের স্বল্পতা অথবা শূন্যতায় পুনঃচক্রগতির (দ্বিতীয় আবর্তন) অভাব।

উল্লিখিত সমস্যাবলি ছাড়াও উপকূলীয় বনায়ন গবাদি পশুচারণ, অবৈধ কর্তন ও দখল ইত্যাদির কারণে মারাত্মক হুমকির মুখে। উপকূলীয় বনায়ন ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে এ অঞ্চলের জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণে এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে বনজ দ্রব্যসামগ্রির সুসম বণ্টনের অভাবে বন-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সীমিত। বর্তমানে শুধু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ গৌণ বনজ সম্পদ আহরণ করে যেমন: ঘাস, মধু ও মাছ। উপকূলীয় বনায়নে অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে, যা এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণের

সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি করবে। এ অঞ্চলের মানুষকে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারি সৃজন, রোপণ কৌশল ও কার্যাদি তত্ত্বাবধানের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ ও উল্লিখিত সুবিধাদির সুষম বণ্টনের মাধ্যমে উপকূলীয় বনায়নের স্থায়ী ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে পারে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন কার্যক্রম আরো বেশি বেগবান হবে ও ভূমির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি আরো বেশি ত্বরান্বিত হবে।

উপকূলীয় বনায়ন ব্যবস্থাপনা:

বনায়ন সফলতার জন্য চারা রোপণের পরবর্তী দুই বছর নিবিড় পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে বনায়ন পরিচর্যার মাত্রা তৃতীয় বছর থেকে কমতে থাকে। কিছু ব্যবস্থাপনা নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো:

- বনায়নস্থল থেকে ভাসমান শেওলা অপসারণ করতে হবে, যা নতুন রোপিত চারার ক্ষতিসাধন করতে পারে
- চারার কান্ডের সাথে যুক্ত কঠিন আবরণ সৃষ্টিকারী জীবসত্ত্বা (যেমন বার্নাকল এবং অয়েস্টার) অপসারণ করতে হবে, এগুলো হাত দিয়ে সরাতে হবে। চারাকে ব্রাশ বা চাকু দিয়ে আঁচড়ানো যাবে না
- চারার সঙ্গে জড়ানো শেওলা ও সামুদ্রিক শৈবাল অপসারণ করতে হবে।
- প্লাস্টিক, ধাতব টুকরা, মৃত গাছ ও অন্যান্য বর্জিতাংশ অপসারণ করতে হবে।
- চারা বেঁচে থাকার হার কম হলে সেক্ষেত্রে বড় আকৃতির চারা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

উপকূলীয় বনায়নে সাফল্য (ভূমি উদ্ধার এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন) ঃ

বাংলাদেশের মতো ঘন বসতিপূর্ণ কৃষিপ্রধান দেশে নতুন জেগে ওঠা চর ভূমির স্থায়ীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজে ম্যানগ্রোভ বনায়ন সবচেয়ে বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে মেঘনা অববাহিকার বদ্বীপ (Delta) সৃজন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। মেঘনাসহ তিনটি প্রধান নদী এবং অন্যান্য শতশত শাখা-নদী বাহিত উর্বর পলিমাটি জমে নতুন বদ্বীপ (Delta) সৃজিত হচ্ছে। এ সকল পলি বিদ্যমান অভ্যন্তরীন ভূমির সাথে, বিদ্যমান চর ভূমির সাথে, দ্বীপ ভূমির সাথে বা নতুন করে নদী বা সমুদ্রে চর বা দ্বীপ সদৃশ চর সৃষ্টি করছে। প্রতি বছর নদী বা সমুদ্র গর্ভে ভূমি ভাঙ্গনের ফলে ভূমির পরিমাণ কমছে এবং নতুন করে চরে জেগে ওঠার ফলে ভূমির পরিমান বাড়ছে। সাটেলাইট ইমেজের তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা ও গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে (১৯৭৩-২০১৫) প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪৯.৫ বর্গকিমি. এলাকা নতুন জেগে উঠছে এবং ৩০.৫ বর্গকিমি. এলাকা নদী বা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হচ্ছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর ১৯ বর্গ কি.মি. ভূমি বিদ্যমান ভূমির সাথে যোগ হচ্ছে (CEGIS কর্তৃক প্রণীত Technical Study Report)। এ ভূমি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভ বনায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বিধায় সরকার ম্যানগ্রোভ বনায়নে মূলধন বিনিয়োগ করছে।

আইনগতভাবে উপকূলে বা নদীতে নতুন জেগে ওঠা চর খাস ভূমি হিসেবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। উপকূলের জেগে ওঠা চরের ভূমি সরকার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে ম্যানগ্রোভ বনায়নের মাধ্যমে ভূমির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য ২০ (বিশ) বছরের জন্য বন্দোবস্ত দিয়েছে। বিশ বছর পর উক্ত ভূমি পূণরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়। যা পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমিহীন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বরাদ্দ দিয়ে থাকে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দ দ্বারা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর এ যাবৎ নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২,৪০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন (Mangrove Afforestation)/উপকূলীয় বনায়ন (Coastal Afforestation) করেছে। এ বনকে 'প্যারা বন'ও বলা হয়। উপকূলীয় বনায়ন এ সকল বনায়ন মূলতঃ উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় সৃজন করা হয়েছে। এ সকল ম্যানগ্রোভ বনায়নে প্রধানতঃ কেওড়া, বাইন, গেওয়া, কাকড়া, গরান, সুন্দরী, গোলপাতা, পশুর, ধুন্দল, ছৈলা ইত্যাদি প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে প্রচুর ম্যানগ্রোভ বনায়নের সুযোগ রয়েছে। CEGIS-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে ৬৬,৭৫২.০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন উপযোগী নতুন চর জেগে উঠছে। সৃজিত উপকূলীয় বনে হরিণ, মেছোবাঘ, কুমির, শুকর, শিয়াল,

বানর, বনবিড়াল ইত্যাদি বন্যপ্রাণী এবং বালিহাঁস ও বেশ কিছু প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এই বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারের এক বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, লইট্যা, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষিকাজ সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী (Green belt) হিসেবে কাজ করছে, সেই সাথে কার্বন মজুদ (Carbon Content) বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও মাছের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরী করেছে।

- উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৩০ হেক্টর চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছাস ও নদী ভাঙ্গন এর মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।
- উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতি'র অপার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান সম্ভব। এই উপকূলীয় বনায়ন যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য হতে পারে অন্যতম প্রধান "Nature Based Solution" তেমনি দেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি।

নিজেরই ঘরে আগুন

মনিরুজ্জামান বাদল

মানুষ ছিলনা উল্লেখযোগ্য কিছু
মানুষ হয়ে উঠার আগে
তবে, ভালবাসা ছিল-
মাটির সাথে বীজের,
বীজের সাথে বনভূমির,
বনভূমির সাথে গাছ-গাছালির,
গাছ-গাছালির সাথে পাখ-পাখালির।

নদীর সাথে সখ্যতা ছিল সমুদ্রের,
নীল বিছানা নিরাপদ আশ্রয়
ছিল সকল জলজ প্রাণের।

মানুষ মানুষ হয়ে উঠার পরই
ভুলে গেল ভালবাসা,
নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করার অপচেষ্টায়
নিয়ত সংগ্রাম,জীবনের মিথ্যা তাগিদে
তারা ধ্বংস করছে
মাটি-বীজ-বনভূমি।

সমুদ্রের নীল জল এখন
নীল বিষের আধার,
মাছেরা হাহাকার করে
আকুলি বিকুলি করে
মাথাকুটে মরে,
ফিরে পেতে জলের আদর।

জলেই প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল,
প্রকাশিত হয়েছিল প্রাণ,
জীবন বেড়ে উঠেছিল
জল,মাটি ও বনভূমির বৈচিত্র্যে,
জীবন ও প্রকৃতি একাকার হয়ে
একসাথে গেয়েছিল ধরণীর গান।

সীমাহীন মোহ আর মায়ার জালে
মানুষ আজ ভুলপথে চলে,
ভালবাসা ভুলে গিয়ে বারংবার
মেতে উঠে জীবন ধ্বংসের
ভুল খেলায়, নিজেই আগুন দেয়
নিজেরই ঘরে !

(লেখকঃ অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)

BIODIVERSITY CONSERVATION AND HUMAN HEALTH: ONE HEALTH APPROACH

Md. Jahidul Kabir
Deputy Chief Conservator of Forests, Forest Management Wing

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity (WHO)". Health is our most basic human right and one of the most important indicators of Sustainable Development Goals (SDG 3). At the same time, the conservation and sustainable use of biodiversity is imperative for the continued functioning of ecosystems at all scales and for the delivery of services that are essential for human health. Renowned conservation ecologist Dr. Eric W. Sanderson said, "Conservation is not just about biodiversity but about human relationship with that biodiversity." Post 2020 Global Biodiversity Framework is going to set out an ambitious plan to implement broad based action to bring about a transformation of society's relationship with biodiversity to achieve 2050 goal "Living in harmony with nature".

Biodiversity and human health are interlinked in various ways. Firstly, biodiversity gives rise to health benefits. For example, the variety of species and genotypes provide nutrients and medicines. The ecosystem services (provisioning, supporting, regulating and cultural) directly related to water and air purification, pest and disease control and pollination that benefit human health. A second type of interaction arises from drivers of change that affect both biodiversity and health in parallel. For example, air, water and soil pollution can lead to biodiversity loss and have direct impacts on health. A third type of interaction arises from impact of health sector intervention on biodiversity and of biodiversity related intervention on health. For example, the use of pharmaceuticals may lead to release active ingredients in the environment, damage species and ecosystem. Protected areas or hunting ban could deny access of local communities to bushmeat and other wild foods with negative nutritional impact though PA's have numerous positive benefits. (Source: Connecting global priorities: Biodiversity and Human Health, CBD and WHO publication 2015).

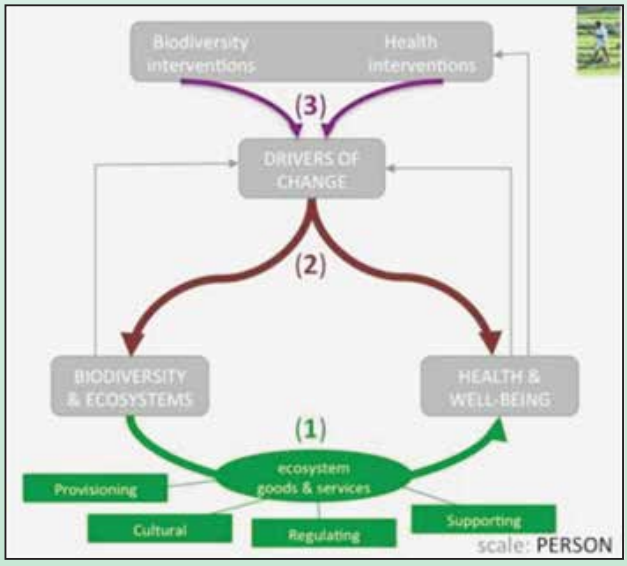

Fig 1: Biodiversity and human health linkage

The Covid 19 pandemic once again proves how diseases that spillover from animals to humans (zoonotic diseases) can emerge and re-emerge with devastating impacts across all sectors and agencies, nationally and internationally to better prevent, prepare for and respond to these threats. Annual report of

One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP) develops a definition of One Health that states "One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystems. It recognizes the health of humans, domestic and wild animals, plants and wider environment (including ecosystems) are closely linked and interdependent (OHHLEP)".

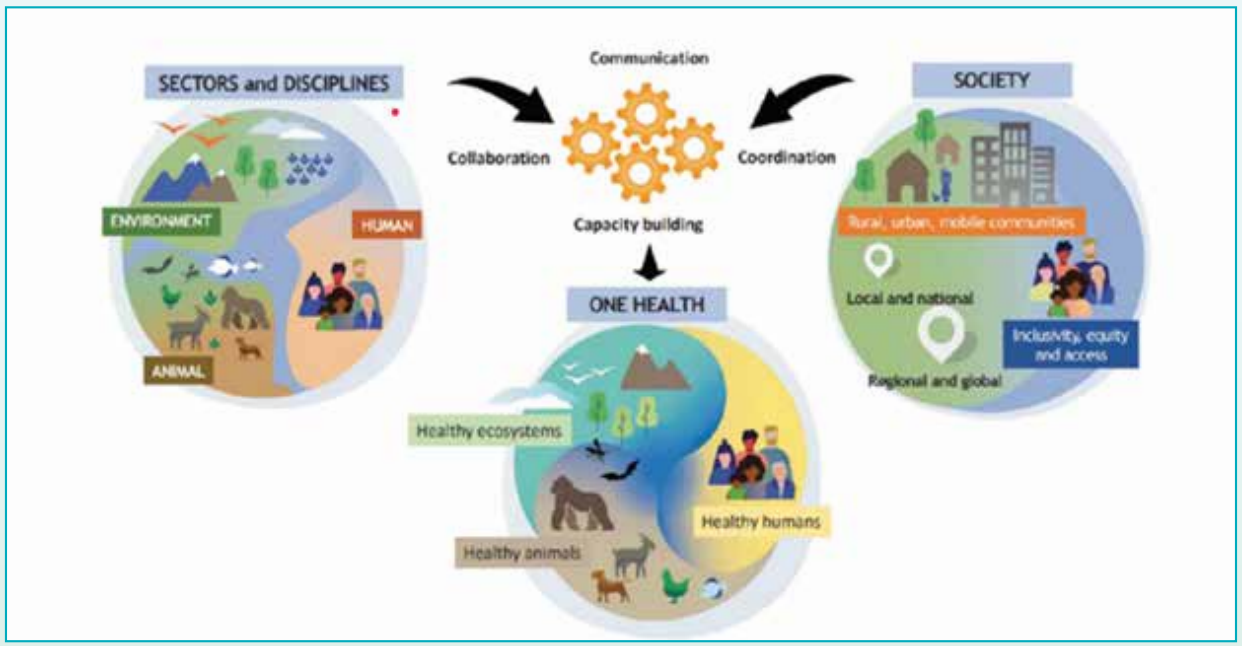

Fig 2: OHHLEP one health definition visual

We are in an age of Pandemic and need to be equipped to prevent or stop next pandemic. Integrated approaches such as ecosystem approach, one health approach may unite different fields, develop mutual understanding and Coordination, communication and collaboration among health, environment and agriculture sectors through transforming policies and activities could be the best option to prevent next pandemic.

সাদা শেয়ালের চমক

ড. মনিরুল এইচ খান
অধ্যাপক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘদিন দূরের কোন বন-বাদাড়ে দূর্লভ কোন প্রাণীর খোঁজে যাওয়া হয় না। ঘরে বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ঘরের আশেপাশে, অর্থাৎ সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়াব। এই এলাকায় এখনও অনেক বুনো ঝোঁপঝাড় আছে, তবে ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে শিক্ষক জীবন পর্যন্ত এত ঘোরাঘুরি করেছি যে, এই এলাকায় চমক দেওয়ার মত কোন বন্যপ্রাণী দেখার আশা করি না।

নতুন বছর ২০১৪ সালের প্রথম দিন আমার ছাত্র নাইমুস সাদাত রনিকে সঙ্গে নিয়ে বের হলাম ভর দুপুরে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কিছু বুনো ঝোঁপঝাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ শেয়ালের ঝগড়া করার খ্যাক-খ্যাক শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঝোঁপের পাশে তিনটি শেয়াল। তাদের একটি সম্পূর্ণ সাদা! সাদা শেয়ালটি অপর দুটো স্বাভাবিক শেয়ালের একটির সঙ্গে ঝগড়া করছে। পর মুহূর্তেই সাদা শেয়ালটি তার প্রতিদ্বন্দীকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূর। এর পর বীরের বেশে ফিরে এল তৃতীয় শেয়ালের কাছে। বুঝতে পারলাম এরা জোড়া বেঁধেছে। সাদা শেয়ালটি পুরুষ এবং আকৃতিতে তার সঙ্গিনীর তুলনায় কিছুটা বড়। আর সে এইমাত্র এক প্রতিদ্বন্দী পুরুষ শেয়ালকে তার সঙ্গিনীর কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এল। এরপর এক ঘন্টার বেশি সময় এরা একসঙ্গে শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিল। সাদা পুরুষ শেয়ালটি কিছুক্ষণ পরপর তার সঙ্গিনীকে শুঁকছিল আর আদর করে সারা গায়ে মোলায়েম কামড় দিচ্ছিল। আমি বড় একটা কাঁঠাল গাছের পেছনে লুকিয়ে তাদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করলাম, ছবি তুললাম এবং ভিডিও করলাম। এ এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

যে কোন সাদা বা শ্বেতী বন্যপ্রাণী (ইংরেজিতে যাকে বলে 'এ্যালবিনো') প্রকৃতিতে খুবই দূর্লভ। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে বাংলাদেশের কোথাও সাদা শেয়াল দেখার নজির নেই। যখন কোন বন্যপ্রাণীর (স্তন্যপায়ী, পাখি, সরিসৃপ, ইত্যাদি) ত্বকে রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয় না, তখন ঐ প্রাণীটি সাদা বা সাদাটে হয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে, প্রাণীটির কিছু অংশ সাদা আর কিছু অংশ স্বাভাবিক। আমাদের দেখা শেয়ালটি ছিল সম্পুর্ণ সাদা। তবে এর নাক ও মুখের উন্মুক্ত চামড়া ছিল গোলাপী এবং চোখ ছিল ধূসর রঙের। সাদা হলেও এর স্বাস্থ্য ছিল বেশ ভাল এবং এর আচরণও ছিল স্বাভাবিক। এর একমাত্র সমস্যা যেটি লক্ষ্য করেছি তা হল, এটি বেশি আলোতে ভালভাবে তাকাতে পারে না। সম্ভবত সে কারণেই দিনের আলোতে বাইরে বের হয় না এবং কোন মানুষ তাকে সহজে দেখতে পায় না। পড়ন্ত বিকেলে যখন রোদ নরম হয়ে এল তখন সাদা শেয়াল আর তার সঙ্গিনী বিশ্রাম সেরে খাবার খুঁজতে বের হল। আমিও তাদের পিছু পিছু চললাম, কিন্তু বেশি দুর আর নজরে রাখতে পারলাম না। সাদা শেয়ালটি ছোট একটা প্রাণী শিকার করল, এরপর সঙ্গিনীসহ হারিয়ে গেল ঘন জঙ্গলে।

সাভার এলাকার বুনো ঝোঁপঝাড় আর শেয়ালের পর্যাপ্ত খাবার যতদিন থাকবে ততদিন এই সাদা শেয়াল, তার সঙ্গিনী আর প্রতিবেশীরা টিকে থাকবে। শেয়াল হাঁস-মুরগী শিকার করে বলে মানুষ তাদের শত্রু বলে বিবেচনা করে। সুযোগ পেলে মারতে বা আহত করতে ছাড়ে না। কিন্তু শেয়াল যতটুকু ক্ষতি করে তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার করে। এরা ফসলের জন্য ক্ষতিকর ইদুর এবং ঘাসফড়িং খেয়ে ফসল রক্ষা করে। আমাদের সকলের উচিৎ শেয়ালের প্রতি সদয় হওয়া।

কেন এবং কীভাবে সুন্দরবনের বাঘ গণনা করা হয়

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের জাতীয় সংসদের মাননীয় এক সদস্য সুন্দরবনের বাঘ গণানাকে একবার তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন। সম্ভবত কয়েক বছর আগের ঘটনা। 'যে বাঘ চোখে দেখা যায় না সেটি আবার গুণে কীভাবে, এসব আনপ্রডাক্টিভ কাজকর্ম অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়' বলে তিনি জোড়ালোভাবে সংসদে বক্তব্য তুলে ধরলেন। যদিও এ ধরণের বক্তব্য আমাদেরকে খুব একটা হতাশ করে না। এ দেশে এ ধরণের কথাবার্তা তো আমরা হরহামেশাই শুনে থাকি। তবে এ বিষয়ে ওই সাংসদকে খুব একটা কোনো দোষ দেওয়া যায় না, দোষটি আসলে আমাদের বাঘের। মাননীয় সাংসদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এ রকম: সুন্দরবনে বাঘ রাখার দরকার কী, আর এত পয়সাকড়ি খরচ করে ওই বাঘ গুণতেই বা হবে কেন।

সুন্দরবনের বাঘ কেন গণনা করা হয়, এ প্রশ্ন খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। বন ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যদের মনে এই প্রশ্নটি জাগতেই পারে। বাঘ গণনার প্রধান উদ্দেশ্য দুটি: প্রথমত, সুন্দরবনের প্রতিবেশব্যবস্থা কেমন আছে, কীভাবে চলছে, সেটি বুঝা। দ্বিতীয়ত, সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তা মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনীয় করণীয় ঠিক করা। বন্যপ্রাণী চোরাশিকারীরা সবসময়ই ওত পেতে থাকে। ব্যবস্থাপনার একটু ফাঁক পেলেই ঢুকে পড়ে বনে। বাঘ কিংবা হরিণ শিকার করে সংবেদনশীল প্রতিবেশব্যবস্থার বারোটা বাজায়। এর সাথে আছে গাছ চোর। এ সকল কর্মকান্ড অব্যাহত থাকলে এক সময় হরিণের আবাস নষ্ট হবে, এতে হরিণের সংখ্যা হ্রাস পেলে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দেবে। অর্থা বাঘ, হরিণ, বন সবই এক সুঁতোয় গাঁথা। বাঘ যেহেতু সুন্দরবন প্রতিবেশ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রাণী, সুতরাং আমরা যদি নিয়মিত বাঘ গুণতে পারি তাহলে প্রতিবেশের স্বাস্থ্য, বনের সার্বিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জেনে তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে পারব। এর ফলে প্রতিবেশ ব্যবস্থার বড় ধরণের কোনো ক্ষতি বা ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

বাঘ গণনা একটি টেকনিক্যাল বিষয়। এ বিষয়ে জ্ঞান ছাড়া এটি জানা-বুঝা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তারপরও সাংসদের মতো সাধারণ মানুষও এই টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা বলে থাকেন। এ সম্পর্কে অনেকে জানতেও চান।

বাঘ গণনায় নানা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এক সময় পায়ের ছাপ ব্যবহৃত হতো। এটি বেশ পুরোনো পদ্ধতি, ভারতে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের সুন্দরবনে ২০০৪ সালে পায়ের ছাপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাঘ যে পথে হেঁটে যায়, সে পথে মাটির উপর তার পায়ের ছাপ রেখে যায়। এই ছাপ থেকে প্রতিটি বাঘ আলাদা করা, মোট সংখ্যা গণনা করা ও বাঘ-বাঘিনী চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এই প্রক্রিয়ায় মারত্মক কিছু ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে। যেমন একটি বাঘ কচিখালীর উলুবনে হাঁটলে পায়ের ছাপ এক রকম হবে, সেই একই বাঘ বালুকাবেলায় হরিণের পেছনে ছুটলে পায়ের ছাপ ভিন্ন হবে সেটি কারও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে কাদামাটির সুন্দরবনে একই বাঘের নানা রকম পায়ের ছাপ ও পরিমাপ হতে পারে। এ কারণে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা বাঘ গণনার এই পদ্ধতি বাতিল করে দেন।

উনিশ শ আশির দশকে অনেক বিজ্ঞানী বাঘের গলায় জিপিএস কলার বা রেডিও কলার পরিয়ে বাঘের এলাকা নির্ণয়ের মাধ্যমে বাঘের সংখ্যা নির্ণয় করেন। নেপালে এই প্রক্রিয়াটি বেশ ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ফাঁদ পেতে বাঘ ধরে তার গলায় জিপিএস কলার লাগানো যেমন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি ব্যয়বহুলও। এছাড়া এতে বাঘের মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্যের উপর নানা ধরণের চাপ পড়ে। আবার বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংখ্যা বেশি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে অধিক সংখ্যায় বাঘের গলায় কলার লাগানোর প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে জিপিএস কলার বা রেডিও কলার পরিয়ে বাঘের সংখ্যা নির্ণয় বর্তমানে খুব একটা অনুসরণ করা হয় না। তবে 'প্রবলেম টাইগার' মনিটর করতে জিপিএস কলার একটি ভালো পদ্ধতি।

বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার মাধ্যমে বাঘের ছবি তুলে বাঘের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বাঘের চলাচলের পথের দুপাশে একজোড়া স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসানো হয়। ক্যামেরার সামনে দিয়ে বাঘ অতিক্রম করলে ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি তুলে। পরবর্তীতে ওই ছবি দেখে প্রতিটি বাঘ আলাদাভাবে চিহ্নিত করে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে বাঘের সংখ্যা বের করা হয়।

বাঘ গণনায় আরেকটি আধুনিক পদ্ধতি হলো ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এই প্রক্রিয়ায় বাঘের মল সংগ্রহ করে তা থেকে মলত্যাগকৃত ওই বাঘের ডিএনএ আলাদা করা হয়। সাধারণত কোনো প্রাণী মলত্যাগ করলে ওই প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রের গাত্র থেকে কিছু কোষ মলের সাথে নির্গত হয়। এই নির্গত কোষ থেকে ডিএনএ আলাদা করে বিশ্লেষণ করতে পারলে আলাদা আলাদা বাঘ নির্ণয় করা যায়। অনেকটা ক্যামেরা-ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে ধারণকৃত ছবিতে বাঘের ডোরা দাগ দেখে যেমন প্রতিটি বাঘ আলাদা করা হয়। এই ডিএনএ পদ্ধতিতে প্রতিটি মলের নমুনা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে তা মাইক্রোস্যাটেলাইট নামক ডিএনএ মার্কার (এক ধরণের ছাঁচ ডিএনএ যা দ্বারা অসংখ্য ডিএনএ কণা থেকে নির্দিষ্ট একটি ডিএনএ আলাদা করা যায়) ব্যবহার করে প্রতিটি বাঘ আলাদা করা হয়। অতঃপর ক্যামেরা-ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে অনুসৃত একই সিমুলেশন মডেল ব্যবহার করে বাঘের সংখ্যা বের করা যায়।

সুন্দরবনে বাঘ গণনায় অতীতে নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ গণনা ও পরিমাপ, ক্যামেরা-ট্র্যাপিং ও জিপিএস কলার পদ্ধতি অন্যতম। ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম জার্মান গবেষক হিউবার্ট হেনড্রিকস সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দরবনে ৩৫০টি বাঘ থাকার কথা উল্লেখ করেন। ২০০৪ সালে বাঘের পায়ের ছাপ গণনা করে সুন্দরবনে ৪৪০টি বাঘ আছে বলে বলা হয়। তবে এই সাক্ষাৎকার কিংবা বাঘের পায়ের ছাপ কোনোটিই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ছিল না। ফলে সংশ্লিষ্ট মহলে বাঘ জরিপের এই ফলাফল গ্রহণযোগ্য হয়নি। ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ক্যামেরা-ট্র্যাপ ও জিপিএস কলার ব্যবহার করে সুন্দরবনে যথাক্রমে ২০০টি ও ৩০০-৫০০টি বাঘের হিসাব প্রকাশিত হয়। প্রথম গবেষণাটি মাত্র ১৫টি ক্যামেরা-ট্র্যাপ ব্যবহার করে, যেটি সুন্দরবনের পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণের ১০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে বাঘের মাত্র ৭টি ছবি ধারণ করতে সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় গবেষণায়টি মাত্র দুটি স্ত্রী বাঘের গলায় জিপিএস কলার পরিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। এই গবেষণা দুটি পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হলেও এতে নমুনা ও বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি ছিল। তা ছাড়া গবেষণা দুটি সুন্দরবনের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সম্পাদিত হয়। ফলে এই গবেষণাদ্বয়ের ফলাফলে পুরো সুন্দরবনের সার্বিক অবস্থা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

২০১৫ সালে ও ২০১৯ সালে প্রকাশিত ক্যামেরা-ট্র্যাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পাদিত জরিপ দুটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য জরিপ। এতে নুমনার পরিমাণ ও বিস্তার মোটামুটি ভালো ছিল। এ দুটি জরিপের সাথে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০১৮ সালে প্রকাশিত জরিপটিও সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশংসিত হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই প্রক্রিয়ায় সুন্দরবনের ১,৯৯৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে ৪৪০টি বাঘের মল সংগ্রহ করে তা থেকে সুন্দরবনে ১২১ বাঘ থাকার তথ্য উঠে আসে। এই পদ্ধতিতে সংখ্যা ছাড়াও বাঘের জিনগত নানা দিক জানা যায়।

নিয়মিত বিরতিতে আমাদের বাঘ জরিপ করা দরকার। অধিকাংশ দেশে বাঘের জরিপ তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পাদিত হয়। আমাদের বাঘ কর্মপরিকল্পনায় তেমনটি বলা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে প্রকাশিত জরিপটি মাঠ-পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ২০১৭-২০১৮ সালে। সে হিসেবে আগামি বছরের শীত মৌসুমে পরবর্তী জরিপ শুরু করতে হলে এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ একটি জরিপের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় তিন বছর লেগে যায়।

Sundarbans Biodiversity and Research Needs for Conservation

Dr. Tapan Kumar Dey
Deputy Chief Conservator of Forest (Rtd)
Bangladesh Forest Department, Dhaka

The Sundarban, covering about one million ha in the delta of the rivers Ganga, Brahmaputra and Meghna is shared between Bangladesh (~60%) and India (~40%), and is the world's largest coastal wetland. As an independent country, Bangladesh, has inherited this piece of 6000 km2 area having 4300 km2 as land and 1700 km2 of brackish water as its best natural heritage. Bangladesh part is the single largest mangrove forest in the world. It is also the largest and contiguous last remaining compact forest in the country. Enormous amounts of sediments carried by the rivers contribute to its expansion and dynamics. Salinity gradients change over a wide range of spatial and temporal scales. The biodiversity includes about 350 species of vascular plants, 58 species of mammals, 320 birds, 59 reptiles, 11 amphibians, 400 fishes including 210 white fishes, 24 shrimps, 14 crabs, 43 mollusks, 1 hemichordate and 1104 invertebrate species.

Species composition and community structure vary east to west, and along the hydrological and salinity gradients. Sundarban is the habitat of many rare and endangered animals (Batagur baska, Pelochelys bibroni, Chelonia mydas), especially the Royal Bengal tiger (Panthera tigris). Javan rhino, wild buffalo, hog deer, and barking deer are now extinct from the area. Since 2000, the Sundarban has been extensively exploited for timber and fuelwood, but now all exploitation of forest products has been banned except Golpata (Nypa fruticans) fish, prawns and fodder. The regulation of river flows by a series of dams, barrages and embankments for diverting water upstream for various human needs and for flood control has caused large reduction in freshwater inflow and seriously affected the biodiversity because of an increase in salinity and changes in sedimentation. Heritiera fomes (locally called Sundari), Nypa fruticans and Phoenix paludosa are declining rapidly.

Bangladesh Sundarbans holds the largest populations of all the species of plants and animals that are present there, barring the ones that share the marine environment. The Sundarbans appeared to be the only forest where Bangladesh Red Book (2016) designated Critically Endangered Saltwater Crocodile, Endangered Masked Finfoot, Finless Porpoise and Irrawaddy Dolphin are present. Literally, the Sundarbans is the only area in Bangladesh where Bengal Tiger roams freely and it represents the largest world population of the tiger in a single forest, of course considering Indian parts of the Sundarbans in it.

It has been reported that the Sundarbans support 58 species of mammals, 320 birds, 59 reptiles, 11 amphibians, 400 fishes including 210 white fishes, 24 shrimps, 14 crabs, 43 mollusks, 1 hemichordate and 1104 invertebrate species.

Comparison of Richness of Faunal Diversity of Sundarbans.

Categories	Number of species available in Bangladesh	Number of species recorded in Sundarbans	% in respect of whole Bangladesh
Mammals	138	58	42.02
Birds	566	320	56.53
Retiles	167	59	35.32
Amphibians	49	11	22.44
Fishes (fresh water an marine)	700	400 (approx.)	57.14
Shrimps	141	24	17.02
Crabs	22	14	63.63
Mollusks	137	43	31.38
Butterflies	305	100 (approx.)	32.78

On other hand, floral diversity also quite high, a total of 245 genera and 334 plant species were recorded under 75 families. In addition, there are 165 algae and 13 orchids having been recorded from this Forest. The Sundarbans flora is characterized by the abundance of tree species such as Sundri, Goran, Keora, Gewa, Kankra and Baen, etc. However, edges of the Sundarbans, facing the water bodies are dominated by the Golpata, Hental, Bola, Baen, reeds and grasses. Sundarbans ecosystem and food web is dynamic and ecological successions can be observed easily. The Sundri is the climax species in the successional stages.

It is the unique habitats of globally threatened species of wildlife like Estuarine Crocodile, Fishing Cats, Barking Deer, Common Otter, Masked Fin-foot, 8 species of kingfishers, Water Monitor Lizard, Gangetic Dolphin, Black Finless Porpoise Irrawaddy Dolphin, River Terrapin, Olive Ridley Turtle, Hawksbill Turtle, Green Sea Turtle, six species of sharks and rays, etc. Sundarbans is a big laboratory for wildlife research, study, and monitoring. Since last mid-century zoologists of Bangladesh as well as India have conducted appreciable research studies on wildlife and biodiversity conservation, which have been published in a number of books, journals, and reports. These have played vital role in wildlife and biodiversity conservation.

Sundarbans ecosystem provide livelihood for c.1.2 million people, helps in carbon sequestration, trapping of sediment and land formation, supports nursery of fishes and aquatic animals, hydrological balance, provide protection from tidal surge and cyclone, is one if the best habitats for globally endangered species of wildlife. It creates ample opportunities for zoological study and research in river, marine and forest ecosystems.

This mangrove forest was quite rich in animal diversity in the past. As per Hunter's Statistical Account of the Sundarbans (1878), "Tiger, Leopards, Rhinoceros, Wild Buffaloes, Spotted Deer, Hog Deer, Barking Deer, Wild Cats, Swamp Deer, Crocodiles and Monkeys were the principal varieties of wild animal". However, the last 150 years or so, due to ecological changes, habitat degradation and human pressure Javan Rhino, Wild Buffalo, Swamp Deer, and Hog Deer have become extinct.

The mammalian fauna is quite rich and comprised of Rhesus Macaque, Spotted Deer, Wild Boar, Ganges Susu, Porcupine, Leopard Cat, Small Claw-less Otter, fruit bats and insect bats. The birds virtually dominate the Sundarbans. These include, ducks and geese, doves, and pigeons, koel and cuckoos, kingfishers, bee-eaters, roller, owls, diurnal birds of prey, prominent being the Brahminy Kite, White-bellied Sea eagle and Crested Serpent Eagle; hoopoe, herons, egrets, cormorants, storks, waders, terns, gulls, Mangrove and other Pittas, Mangrove Whistler,

in our attitude and approach towards the biodiversity of the Sundarbans. Government bodies not only in Bangladesh but also in other countries are always ready to grab the fruitful outcome of any research done by their own or of supporting institutions and non-governmental organizations. Judicious use of such positive results may not harm a society but when these results are taken out of context and used unsustainably the resource depletion is inevitable.

Striking a balance between economic development and maintenance of biodiversity is increasingly challenging in the face of climate change, rapid human population growth and concomitant demand for natural resources. Understanding trade-offs and synergies between these objectives is particularly urgent in tropical forest areas which are home to more than 1.2 billion people. Comprehensive approach is still missing from the greater prospect of evaluating the biodiversity richness of the Sundarbans and its future and potential use for the development of mankind where all parties involved in the Sundarbans' stake be partners. As nature conservationist, we need to do more than making sporadic visits and covering certain aspects. I know these need lots of fund, manpower and long time. I hope the relevant national authorities, funding, and donor agencies as well as international NGOs should make it a point that future research on the Sundarbans biodiversity be based on long term that should not be less than a decade. As there are no national zoological survey and wildlife management departments jobs related to the biodiversity best be awarded to the national-level universities of the country.

We can prioritize the Sundarbans biodiversity conservation research as follows:

1. Update inventory of all animals and plants, including those that are used commercially;
2. As far as possible, species-wise population density estimates of mega species to be attempted. These should not be limited to tiger and crocodiles, and commercial species but those species that are virtually only present in the Sundarbans;
3. Determining the depth of human interference in the biodiversity, its remedial measures and caring for the needs of the people bordering the Sundarbans, who are heavily dependent on the biodiversity resource;
4. Developing ways and means of providing alternative livelihood for the people living around the Sundarbans;
5. Protocols should be developed in such a way that all future pollutions of the water and biodiversity of the Sundarbans can be determined and mitigated.
6. Developing a programme and trying to get funds for a central digital library for the biodiversity species of the Sundarbans.
7. A knowledge hub like Sundarbans Biodiversity Center can be established for better integration of research and monitoring works.
8. Involvement of zoologists in continuous monitoring of fauna including Tiger, deer, crocodiles, etc., to be initiated.

Bibliography

Canonizado, J.A and Hossain, M.A. 1998. Integrated Forest Management Plan for the Sundarbans Reserved Forest, Mandala Agricultural Deployment Corporation and Forest Department, Dhaka, Bangladesh.

Curtis, S.J. 1933. Working Plan for the Sundarbans Division (1931 to 1951). Bangla Government Press, Calcutta, Vol. 1, 175pp.

Dey, T.K. 2007. Deer Populations in the Bangladesh Sundarbans. Bangladesh Forest Department, Banbhaban, Agargaon, Dhaka. 112pp.

IUCN Bangladesh. 2016. Red list of Bangladesh, Vols. 1-7. IUCN- Country Office, Banani, Dhaka.

Khan, R. 2014. Sundarban: rediscovering Sundarban. Nymphaea Publications, Dhaka.

bulbuls, mynas, starlings, flowerpeckers, sunbirds, pipits, and wagtails. Among reptiles, Ringed Lizard, Bengal Monitor, Indian Python, Checkered Keelback, Rat Snake, Green and Short-nosed Whip Snake, Dog-faced Water Snake, Golden Flying Snake, the King Cobra, Banded Krait, Russel's Viper, Pit Viper, etc., are prominent. Of the amphibians, most notable being Common Toad, the Crab-eating Frog, Green Frog, Common Bullfrog, Jerdon's Bull Frog, Narrow-mouthed Frogs, Cricket frogs, etc. Sundarbans marine ecosystem support Whale, Tiger Shark, Hammer-headed Shark, Saw Fish, Guitar Fish, and Hilsa and many other brackish water fishes, and over a thousand species if invertebrates, etc., as well as an appreciable number of recorded and unrecorded plant species from algae to *Aegiceras*.

Considering the richness of faunal diversity, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has declared 3 (three) wildlife sanctuaries (WS) like Sundarbans East WS, Sundarbans West WS and Sundarbans South WS covering an area of **3,17,950.08** hectares in 2017 which is about **52%** of Bangladesh Sundarbans. Considering the global conservation importance of Sundarbans, UNESCO declared its as 798th heritage site in 1997 which include three wildlife sanctuaries. This landscape has been declared as 560th Ramsar Site in 1992. In 2012 Ministry of Environment, Forest and Climate Change has declared 6 (Six) Dolphin wildlife sanctuaries like Chandpai WS, Dhangmari WS, Dudmukhi WS, Shibsa WS, Pankhali WS and Bhadra WS for conservation of Gangetic Dolphin, Irrawaddy, and Bottlenose Dolphin, and Finless Porpoise etc covering water area of **4,497.00** hectares.

Tiger is the top carnivore in Sundarbans food web and this animal have been reduced in number drastically **(approx. 114)** due to a combination of over hunting, poaching, illegal trade, loss of prey, habitat degradation, conflict with human, navigation route and industrialization etc. In Sundarbans, Tiger is an umbrella species and its conservation automatically ensures the protection of large number of flora and fauna included in the Sundarbans mangrove ecosystem.

Sundarban is a big biological laboratory for wildlife research, study and monitoring, and management. Wildlife biologists of India & Bangladesh have conducted thousands of research studies on wildlife and biodiversity conservation which have been published in books, journals, and reports. They have played vital role in wildlife and biodiversity conservation. Sadly, most of the research done so far revolved mostly for commercial fishing and forestry management.

Under these contexts what can be the conservation perspectives of the biodiversity of the Sundarbans, and the answer must lie not only in the commercial exploitation but also comprehensive approach towards conservation and sustainable management of the biodiversity. This revolves round the basic wildlife research that considers fundamental research on the inventorying of the species that are part of wildlife biology and the ones on which life of these species are dependent.

Current trend dictates that nothing can be studied; no programme can be taken or implemented without having knowledge of the intrinsic values of each species and their position in the food chain, ecosystem, and roles in or out of the climate change, global warming, greenhouse gas emission, carbon sink, etc., as well as in human society.

As a conservationist, when we think about the Sundarbans biodiversity, the topics that come to our minds are studying mega species such as the tiger, dolphins, crocodile, few species of birds, reptiles, fishes, crustaceans, butterflies, plant biodiversity, forest composition, salinity, impact of natural calamities such as Sidr, Aila etc.; over-exploitation of forest produces, aquatic recourses and so on. Some of these studies are going on as far as the forestry practices started in the Sundarbans in the 1860s. There is no second thought about having a change in basic assumptions

SOCIOECONOMIC IMPACT OF ECO-TOURISM OF NIJHUM DWEEP NATIONAL PARK

Md Saidur Rashid
Deputy Secretary, Ministry of Railways
and
Former Deputy Conservator of Forests

What is ecotourism? :

Ecotourism is now defined as "responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education" (TIES, 2015).

Principles of Ecotourism:

Ecotourism is about uniting conservation, communities, and sustainable travel. This means that those who implement, participate in and market ecotourism activities should implement the following ecotourism principles:

1. Reduce physical, social, behavioral, and psychological impacts.
2. Build environmental and cultural awareness and respect.
3. Provide positive experiences for both visitors and hosts.
4. Make available direct economic benefits for conservation.
5. Produce economic benefits for both local people and private industry.
6. Provide impressive interpretative experiences to visitors that help to understand about political, environmental, and social climates of host countries.
7. Design, create and operate low-impact facilities.
8. Recognize the rights and spiritual beliefs of the Local People and work in partnership with them to create empowerment (TIES, 2015).

Socioeconomic impact of ecotourism:

“Ecotourism potentially provides a sustainable approach to development” (Okech, 2009). Ecotourism is a form of natural resource-based tourism which is educational, low-impact, non-consumptive and locally oriented. Local people involve in this industry and obtain the majority of the profits to confirm sustainable development (D’ Angelo et al., 2010).In addition to that, ecotourism is considered as a solution for reducing environmental and socioeconomic problems and it is a sustainable development instrument in ecologically sensitive area. Moreover, ecotourism is an important tool used for based tourism which is educational, low-impact, non-consumptive and locally oriented. Local people involve in this industry and obtain the majority of the profits to confirm sustainable development (D’ Angelo et al., 2010).In addition to

that, ecotourism is considered as a solution for reducing environmental and socioeconomic problems and it is a sustainable development instrument in ecologically sensitive area.. Moreover, ecotourism is an important tool used for contribution to conservation of the natural landscape and helps to reduce poverty in an underdeveloped regions (Barkin, 1996; Gregory, 2005; Robert and Santos, 2005; Williams and Ferguson, 2005; Açiksöz et al., 2010).

Nijhum Dweep National Park:

Nijhum Dweep is a cluster of small islands, situated about 31 km south west of Hatiya Upazilla (sub district) head quarter under Noakhali District, at the confluence of the Meghna estuary on the Bay of Bengal. This island slowly developed as an alluvium in the early 1950s from the Bay of Bengal and since 1972 Bangladesh Forest Department has been involved in the planting of mangrove trees *Sonneratia apetala* (local name, keora), *Avicennia officinalis* (local name, Baen), *Excoecaria agallocha* (local name, Geoa), *Bruguiera gymnorrhiza* (local name, Kakras) etc. The newly plantation land developed floral cover and gradually evolved as an ecosystem. During the next 40 years, Nijhum Dweep became established as mangrove ecosystem on this island in the southern part of Bangladesh. Now, this island contains 12,360.40 acres mangrove forest raised by Bangladesh Forest Department. This conversion of this bare island to a developed ecosystem is an outstanding example of the Bangladesh Forest Department's efforts to develop and sustain man made ecosystems in Bangladesh. In 2001, Nijhum Dweep was declared as National Park by the Government of Bangladesh. According to the notification of national park, Nijhum Dweep national park covers 40,390 acres of land (Feeroz et al., 2015).

A total of 152 plant species representing 55 families have been found in Nijhum Dweep national park. Among the species, 66 belong to trees, 15 belong to shrubs, 58 belong to herbs and 13 belong to trees. Six species of amphibians and 23 species of reptiles have been found in this national park. A total of 193 species of birds have been found in this national park and among those birds 76 species are migratory. World's largest population of Indian skimmer found in this national park. A total of 17 species of mammals were found in this national park.The current assessment of the spotted deer population in Nijhum Dweep is approximately 2000. This national park has huge scope for ecotourism (Feeroz et al., 2015). According to IRG 2012, the population of Nijhum Dweep is around 20,000. Fishing and farming are the main occupation of this population and most of the people are directly involved in fishing and farming.70% people of Nijhum Dweep are fisherman and the rest 30% are farmer. People are also involved in livestock farming (Feeroz et al., 2015).

Fig: Famous spotted deer of Nijhum Dweep national park

Study of socio-economic impact of Nijhum Dweep national park:

This national park has huge scope for ecotourism. Nijhum Dweep is one of the most important tourist destination in Bangladesh. The national park consists of 11 char lands (islands).But, tourists visit mainly Char Osman and Domar Char .This national park is famous for spotted deer, mangroves and migratory birds. The tourism season of this park is from October to March. But, peak season is December to January. This park is full of tourists on weekend two days in tourist season.

The study was done in 2016 as a part of dissertation submitted by this writer when he was a student of MSc program in Climate Change at University of East Anglia, United Kingdom. The aim of the study of the study was assess socioeconomic benefits from the eco-tourism in Nijhum Dweep national park. For collecting data a group meeting with different stakeholders like motor cycle drivers, boat owners, restaurant owners, tourist guides was arranged. Besides this, in Nijhum Dweep national park, a group meeting with different stakeholders of ecotourism activities was arranged. There were 46 motor cycle drivers, 15 tourist boat owners,4 restaurant owners, 4 hotel owners and 4 tourist guides in the national park. Among those,23 motor cycle drivers, 8 tourist boat owners, 4 restaurant owners, 4 hotel owners and 4 tourist guides were present. Questionnaires regarding number of tourists visit, their income and employment in ecotourism, salary of staffs employed in hotel, restaurants and tourist boats were asked to the participants. Moreover, questionnaires regarding socioeconomic benefits were asked to participants of the group meeting.

There is no census regarding numbers of tourists visiting this national park. But local stakeholders informed that the number of tourists visiting this park is approximately 25,000-30,000 per year. Local residential hotel owners informed that the number of tourists stay this national park at night is approximately 8,000. Other tourists come this park early in the morning from Hatiya upazilla headquarters, observe the beautiful natural view of the parks and leave the park at the evening .Employees in Hotels and restaurants, motor cycle drivers, staffs in tourist boats and tourist guides are involved in ecotourism activities. Among those, employment in tourist boats is the highest .The total number of tourist boats is 15 and the number of employees in tourist boats is 50. Usually, during tourist seasons these boats are used to carry tourists. But, during other season, these boats are used in other purposes. So the income from the ecotourism sector is their extra income.The number of motor cycle drivers is 46.These motor cycle drivers carry regular passengers. But during tourism season, they earn extra income from tourists. The total number of employees in hotels and restaurant is 13 and 16 respectively and there are only four trained tourist guides in this park. Tour guiding is their part time job. In other times, they work in fishing boats, agriculture and other household activities .The highest income comes from motor cycle sectors i.e. approximately 20,70,000 BDT(25,875 USD). Usually tourists visit inside the national park by motor cycles. Sometimes, motor cycle drivers act as tourist guides. In most cases, the tourists give some tips to the motor cycle drivers.

Second highest income comes from tourist boats. Usually, tourists come from Tomoruddin port of Hatiya Upazilla headquarter to the national park by big tourist boats. The number of these types of tourist boats is 5.On the other hand, tourists use small boats to visit in the small canals

inside the mangrove forest. River cruising inside the mangrove forest is very popular among tourists. Sometimes, tourist observe the beautiful spotted deer inside the mangrove forest from these small boats. The total number of small tourist boats in this park is 10.The total income from tourist boats is approximately is 16, 65,000 per year (20,812.5 USD) .The income from hotels and restaurants is 16, 54,000 BDT (20,675 USD) and 13, 42,000 BDT (16,775 USD) respectively. The income from tour guiding is very minimum i.e.approximately 1, 20,000 BDT (1,500 USD) .But this income is part time income of the tourist guides .The income from hotels and restaurants is 16, 54,000 BDT (20,675 USD) and 13, 42,000 BDT (16,775 USD) respectively. The income from tour guiding is very minimum i.e.approximately 1, 20,000 BDT (1,500 USD) .But this income is a part time income of the tourist guides . So, 129 persons are directly involved in ecotourism activities of Nijhum Dweep.

Besides this, during tourism season, selling and income of the local small shops have been increased .Moreover, different types of sea fish are available in Nijhum dweep. These sea fish are popular among tourists. So, poor fishermen obtain a good price by selling these fish during tourism season.Generally, ecotourism in Nijhum Dweep has multiple benefits. The economic condition of the people of the periphery of the national park is very vulnerable. People depend only agriculture and fishing in the sea (Feeroz et al., 2015). Local people usually do not obtain good price by selling their agri products and fish. Ecotourism helps them to obtain good price during tourism season. Specially, motor cycle drivers and owner and staffs of tourist boats, hotels and restaurants earn more money from ecotourism. They can spend these money to improve their food quality, housing, health and educational facilities of their family members. Moreover, their purchasing capacity and quality of life have been increased. On the other hand, as the Nijhum Dweep national park has created employment opportunity of local people, increased income and quality of life, changed socioeconomic condition of local people, the local people are very much conscious about the conservation of the national park. Local forest officers informed me that local people helped them to protect illicit felling, deer and migratory birds hunting and encroachment. Sometimes, they inform secret information to the local forest officer regarding forest crime occurring inside the national park. So, ecotourism helps to improve socioeconomic condition of the local people as well as conservation of the national park.

References:

Açiksöz S, Görmüs S, Karadeniz N (2010). Determination of ecotourism potential in national parks: Kure mountains national park, Kastamonu-Bartin, Turkey. African J. Agric. Res., 5(8): 589-599.

Barkin D (1996). Ecotourism: A tool for sustainable development. Retrieved 16 June 2010

D'Angelo R, Sachasiri T, Vaccaro N, Welie MV, Vargas A, Yongsanguanchai N (2010). Post-tsunami ecotourism development: solutions for the laem khruat village. pp. 90. Retriewed 14

Feeroz and Uddin, 2015. Biodiversity of Nijhum Dweep National Park, Bangladesh Forest Department, Dhaka, Bangladesh.

Gore, A., 2009, An Inconvenient Truth, Rabowsky, London .Latvia's Gauja National Park. Landscape Res. 30: 413-30

Okech NR (2009). Developing urban ecotourism in Kenyan cities: A sustainable approach. J. Ecol. Natural Environ., 1(1): 1-6.

The International Ecotourism Society, 2015.

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামাজিক অংশগ্রহণ: বিবিসিএফ মডেল

মোল্যা রেজাউল করিম
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণি ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা

ভূমিকা ঃ বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রচলিত ধারনার সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কিছুটা পার্থক্য আছে। বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বনাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকার বনজ সম্পদ প্রহরা ও সংরক্ষণ করতে হলেও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কোন সুনির্দিষ্ট স্থান বা এলাকা নেই। জীববৈচিত্র্যের উপাদান সমুহ বন ও বনের বাহিরের পরিবেশে এমনকি মানুষের গৃহস্থলীতেও বিদ্যমান। ঘরবাড়ী, বাসগৃহের আনাচে কানাচে থেকে শুরু করে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, নগর-শহর সর্বত্রই জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান। বৃহত্তর ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্ট সমুহ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এর প্রতিটি উপাদান সমুহকে সযত্নে সংরক্ষণ ও স্ব স্ব পরিবেশে বিদ্যমান রাখা আবশ্যক। দেশের বনাঞ্চল ও বিলাঞ্চল সহ বনের বাহিরে মানুষের বসতির আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান জাতের প্রানী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের নামই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। সরকারী ব্যবস্থাপনায় বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাঠামো গড়ে উঠলেও আমাদের দেশের অবশিষ্ঠ বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ও মানুষের বসতির আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান জাতের প্রানী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের অসচেতনতা ও প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে প্রকৃতিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য বা ইকোসিস্টেমের মহামূল্যবান কম্পোনেন্ট সমুহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় অহরহ। প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের এসকল গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট তথা বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য তাই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণকারী স্থানীয় জনসাধারনের সমন্বিত উদ্যোগ তথা True Community Participation।

Bangladesh Biodiversity Conservation Federation (BBCF) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাখি, বন্যপ্রানী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে যা সামাজিক আন্দেলনের রুপ পরিগ্রহ করেছে। বন্যপ্রানী, পাখি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী জনবল সংকটের বিকল্প সমাধান উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন, বন্যপ্রানী-পাখি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী ব্যয়হ্রাস, সময় ও শ্রম সাশ্রয় এবং বাস্তবানুগ কার্যকর হস্তক্ষেপ (Action) পদ্ধতি প্রয়োগ এবং জনসাধারনের মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলী সৃষ্টি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ব-স্ব এলাকায় অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতার উন্নয়ন এবং জনসম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

BBCF প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ;

২০১২ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার অধিক্ষেত্র নিয়ে উক্ত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি, বন্যপ্রানী ও পাখি সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তরের অধীন "বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী" নামক একটি বন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা অর্থ্যাৎ সমগ্র দেশের এক চতুর্থাংশ ব্যাপী বিস্তৃর্ণ অধিক্ষেত্র সম্বলিত এই অঞ্চলে প্রকৃতিগতভাবে পাখি ও বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য থাকলেও তা সংরক্ষণের জন্য দাপ্তরিক ও মাঠ পর্যায়ে মাত্র ০৮ (আট) জন জনবল নিয়োগ করা হয়। অধিক্ষেত্রের কয়েকটি স্থলবন্দর ও সীমান্ত পথে বিপুল পরিমান বন্যপ্রানী ও পাখি পাচার রোধ, বৃহত্তম চলনবিল, জবাইবিল, আন্দাসুরা বিল, আসুরার বিলসহ পদ্মা, যমুনা, তিস্তা, মহানন্দা, বড়াল নদীর চরাঞ্চলে দেশীয় ও অতিথি পাখি শিকার প্রতিরোধে অত্যন্ত সীমিত জনবল ও লজেষ্টিক্স ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। বিপুল পরিমান পরিযায়ী পাখি শিকার, ক্রয়-বিক্রয়, মাংস ভক্ষন, হোটেল ও হাটবাজারে বিক্রয়

প্রতিরোধে নবসৃষ্ট উক্ত বন বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (বর্তমানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণি ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা) কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারনকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করা, নানামুখি আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুনাবলী বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন করে উক্ত বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের পাখি, বন্যপ্রাণী, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

তার আহবানে সাড়া দিয়ে উত্তরবঙ্গের দুটি প্রশাসনিক বিভাগের ১৬টি জেলায় বিপুল পরিমাণ জনসাধারণের মাঝে পরিবেশ, প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম সম্পর্কে ধারন, গুরুত্ব, সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা ও কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা সৃষ্টি হয়। জনগনের অংশগ্রহনে মাঠ পর্যায়ে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, নদীর অববাহিকা ও তটভূমিতে নিরাপদ পাখি ও জীবজন্তুর আবাস ও বিবরণ ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। স্থানীয় হাটবাজারে ব্যপক প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। জনসাধারনের নেতৃত্বে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে হাটবাজারে পাখি ও বন্যপ্রানী বিক্রয়, বিলাঞ্চলে শিকার ও হত্যা, আটক রেখে পাখি পালন প্রতিহত করা হয়। তাছাড়া উক্ত সময়কালে অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় বিভিন্ন স্থানে শতাধীক পাখির কলোনী চিহ্নিত করে সেই সব কলোনীর পাখি নিধন প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ, সচেতনতা সৃষ্টি ও পাখি কলোনী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। এলাকাবাসীকে পাখি সংরক্ষণের গুরুত্ব, ইকোসিস্টেমে পাখির প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে ঐসব কলোনীর পাখির নিরাপত্তা প্রদান, আবাসস্থল সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা সহ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণের বিষয়ে নানামুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

দেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য, পাখি, বন্যপ্রাণী ও এদের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রকৃতি প্রেমী জনসাধারণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে গঠন করা হয় বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (Bangladesh Biodiversity Conservation Federation (BBCF) গঠন করা হয়। BBCF বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সারাদেশের দুই শতাধিক প্রকৃতি ও পরিবেশবাদী সংগঠন লাভ করেছে। উক্ত সংগঠনের মোট স্বেচ্ছাসেবী সংখ্যা প্রায় ১২,০০০ (বার হাজার), যারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাখি, বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং জীববৈচিত্রের আবাস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণে সর্বসাধারণকে সচেতন করা, প্রশাসনকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করা ও সরকারী কর্মসূচীসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপনের মাধ্যমে সরকারকে পরিবেশ, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান। উদ্যেগটি বাংলাদেশে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে True Community Participation Model এর উদাহরন হিসেবে ব্যপক পরিচিত ও সুনাম অর্জন করেছে। আরো বহু সংখ্যক স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিবেশবাদী সংগঠন BBCF এর সদস্য পদে অধিভূক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রকৃতি প্রেমী মানুষদের স্বেচ্ছাসেবী এ সংগঠন বর্তমানে সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী সমিতি/কমিটি গঠন করে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। Bangladesh Biodiversity Conservation Federation (BBCF) এর বর্তমান কর্মক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ। তাছাড়া বাংলাদেশের জীরবৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে বর্তমানে এটিই সর্ববৃহৎ প্লাটফরম। দেশের উত্তরাঞ্চল হতে শুরু হওয়া এ সংগঠনের কাজ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যপক প্রচার ও পরিচিতি লাভ করেছে।

সময়ের পরিক্রমায় BBCF দেশের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে True Community Participation Model-এর বাস্তব উদাহরনে পরিণত হয়েছে। BBCF এর স্বেচ্ছাসেবীগণ নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে সরকারকে তথা দেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষায় অনবদ্য অবদান রেখে চলেছেন।

অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ক) অগ্রাধিকারঃ "বন্যপ্রানী, পাখি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষা করে অনাগত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ বিনির্মান করা"

খ) উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১. সরকারী জনবল সংকটের বিপরীতে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করে জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রানী সংরক্ষণ;

২. জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রানী সংরক্ষণে সরকারী আর্থিক সংশ্লেষ নুন্যতম পর্যায়ে সীমিত রাখা;

৩. ইকোসিস্টেমের উপাদান সমূহের প্রতি স্থানীয় জনসাধারনকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করার মাধ্যমে তাদের দায়িত্বশীলতা উন্নয়ন;

৪. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারী কার্যক্রমের সাথে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

৫. জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, বিচরনক্ষেত্র ও প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ, উন্নয়ন;

৬. জনসাধারণ কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও তার আবাসস্থল বিধ্বংসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ;

৭. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী সময়, অর্থ ব্যয়, শ্রম, দীর্ঘসুত্রিতা ও জনঅজ্ঞতা হ্রাস।

ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ ঃ

ক. স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতিপ্রেমী যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে কয়েকটি ডিজিটাল ক্যামেরা প্রদান করা হয়। ফলে তারা প্রতিদিন তাদের আশেপাশে জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতি বিরোধী কোন কর্মকান্ড লক্ষ্য করলে তার ছবি তুলে, ই-মেইল ও ফেসবুকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করে, ফলে সাথে সাথে প্রতিকার করা হয়।

খ. সরাসরি যোগাযোগ নাম্বার ও ঠিকানা সম্বলিত ২´´ × ১.২৫´´ সাইজের ষ্টিকারে "আপনার একটি টেলিফোন কল একটি প্রাণীর জীবন বাঁচাতে পারে, আপনিও হতে পারেন একজন পরিবেশ কর্মী" লেখা সম্বলিত ২০,০০০ টি ষ্টিকার তৈরী করে উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলায় বিভিন্ন হাটবাজার, দোকান, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করা হয়। ফলে জনসাধারনের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

গ. স্থানীয় হাট বাজার সমূহে (বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০০ শতাধিক হাটবাজারে) বাজার বার/হাটের নির্ধারিত দিনে জনবহুল স্থানে ভ্যানগাড়ী/রিকশা/সুবিধাজনক উঁচুস্থানে দাড়িয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান। তবে বিশেষভাবে বক্তৃতাকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি (চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর) বা বাজার কমিটির সভাপতি/সদস্য অথবা শিক্ষক শ্রেনীর কাউকে উক্ত বক্তৃতায় উপস্থিত করে তাঁকে দিয়েও কিছু কথা বলানোটা ছিল বিশেষ কৌশল যাতে সেই ব্যক্তিও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত হন।

ঘ. স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতিপ্রেমী ব্যক্তি/ব্যক্তিগনকে একত্রিত করে স্ব স্ব এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা, যাতে উক্ত কমিটিতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা তৈরী হয়।

BBCF প্রতিষ্ঠার ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সৃষ্ট প্রভাব ও সামাজিক পরিবর্তন ঃ

BBCF গঠনের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহনে ঃ-

ক. জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রানীর নিরাপদ বিচরণ, আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

খ. পাখি ও বন্যপ্রানী ক্রয়-বিক্রয়, শিকার, হত্যা, পরিবহন, আটক রাখা যে আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ, জনসাধারণ তা বুঝতে শিখেছে।

গ. ইকোসিস্টেম ভারসাম্য রক্ষায় জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঘ. প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবৎ এ সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীগন কর্তৃক প্রায় ৭০ হাজার বন্যপ্রানী ও পাখি উদ্ধার, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও পরিচর্যা প্রদান এবং প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

ঙ. পাখি বিধ্বংসী এয়ারগান ও কারেন্ট জাল ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

BBCF প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসাধারণ অর্জন ঃ

BBCF গঠনের ফলে উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলায় জনসাধারনের অংশগ্রহন ও সম্পৃক্ততায় জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রানীর নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও

ক. (Bangladesh Biodiversity Conservation Federation (BBCF) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাখি, বন্যপ্রানী, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীব বৈচিত্রের আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে True Community Participation Model সৃষ্টি করা হয়েছে।

খ. বন্যপ্রানী, পাখি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী জনবল সংকটের বিকল্প সমাধান উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ. বন্যপ্রানী পাখি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী ব্যয় হ্রাস, সময় ও শ্রম সাশ্রয় এবং বাস্তবানুগ কার্যকর হস্তক্ষেপ (Action) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঘ. জনসাধারনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ব স্ব এলাকায় অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতার উন্নয়ন এবং জনসম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে জনগনের দলগত উদ্যেগ উৎসাহিত করন, সরকারী সেবার মানোন্নয়ন, নাগরিকের অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা বৃদ্ধি, স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিভার উন্নয়ন, জনসাধারনের নেতৃত্বের গুণাবলী ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সরকারী কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে পুনঃকৌশল প্রয়োগ তথা সর্বপরি সরকারী কার্যক্রমে ব্যপক সহায়তার প্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছে।

Community Participatory Model এর টেকসই ব্যবস্থাপনা ঃ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দেশের প্রথম ও একমাত্র Community Participatory মডেলটি বন অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে ব্যপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হওয়ায় ইতোমধ্যে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের সাথে সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজটি এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া East Asian Australasian Flyway Partnership (EAAFP), CMS, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন এ ধরনের জনঅংশগ্রহন মডেলকে ব্যপক প্রশংসা করেছে। সরকারী পৃষ্টপোষকতা পেলে এ কার্যক্রম দেশে গতি ছড়িয়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

Community Participatory Model টেকসই করার জন্য সরকারী পৃষ্টপোষকতা ও আর্থিক সহায়তা ঃ

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (BBCF) এর কোন আর্থিক উৎস নেই। পাখি, বন্যপ্রাণী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমুহের সদস্যরা ব্যক্তিগত সামান্য অর্থ দ্বারা এই মহান কাজটি পরিচালনা করে আসছেন। ফলে আর্থিক সংকটের কারণে এই সংগঠন তার কাংখিত মানে সেবা প্রদান অব্যহত রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। তাছাড়া পাখি ও বন্যপ্রাণী উদ্ধার, চিকিৎসা ও অবমুক্ত করার কাজে তাৎক্ষনিক সাড়া দিতে, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানের যাতায়াত সহ অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করতে সংগঠনসমুহ হিমশিম খাচ্ছে। আর্থিক সংস্থান না থাকায় স্বেচ্ছাকর্মীদের অনেকেই নিষ্ক্রীয় হয়ে যাচ্ছেন।

সরকারী কার্যক্রমকে সহায়তাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমুহকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার নিয়ম বিভিন্ন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে প্রচলন আছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, ধর্ম মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সরকারী সংস্থার ন্যায় আপনার বন অধিদপ্তরের অধিন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (BBCF) এর অধিভূক্ত ১২০ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আর্থিকভাবে বাজেট সহায়তা প্রদানের জন্য বন অধিদপ্তরের অধিন রাজস্বখাতে একটি তহবিল সৃষ্টির ও বরাদ্দ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে মর্মে অর্থ মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের নিকট হতে জানা যায়।

দেশব্যাপী পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখতে সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বোচ্ছায় কাজ করে যাওয়া বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (BBCF) এর নিবেদিতপ্রাণ প্রকৃতিপ্রেমীদের অতিমূল্যবান অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান এবং মানবতার ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ ভাবে এগিয়ে যাওয়ার কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বন অধিদপ্তরের পক্ষে একটি আর্থিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (BBCF) এর অধিভূক্ত ১২০ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে বাজেট সহায়তা প্রদানের জন্য রাজস্বখাতে বাৎসরিক মোট = ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার (১২০ টি আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিটিকে ৫ লক্ষ টাকা এবং বিবিসিএফ কেন্দ্রীয় কমিটিকে ৫০ লক্ষ টাকা) একটি তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে অনুরোধ করছি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতিবাচক অবদান ঃ

ক. Bangladesh Biodiversity Conservation Federation (BBCF) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাখি, বন্যপ্রানী, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে True Community Participation Model সৃষ্টি করা হয়েছে।

খ. বন্যপ্রানী, পাখি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী জনবল সংকটের বিকল্প সমাধান উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ. বন্যপ্রানী পাখি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী ব্যয় হ্রাস, সময় ও শ্রম সাশ্রয় এবং বাস্তবানুগ কার্যকর হস্তক্ষেপ (Action) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঘ. জনসাধারণের মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলী সৃষ্টি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ব স্ব এলাকায় অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতার উন্নয়ন এবং জনসম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষনে জনগনের দলগত উদ্যোগ উৎসাহিত করন, সরকারী সেবার মানোন্নয়ন, নাগরিকের অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা বৃদ্ধি, স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিভার উন্নয়ন, জনসাধারনের নেতৃত্বের গুনাবলী ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সরকারী কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে পুনঃকৌশল প্রয়োগ তথা সর্বপরি সরকারী কার্যক্রমে ব্যপক সহায়তার প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে। এটাকে বাঁচিয়ে রেখে দীর্ঘমেয়াদে জাতী এর সুফল ভোগ করতে পারে।

DEVELOPMENT DILEMMA OF ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs): INSIGHTS FROM FOREST, ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE SECTORS

Dr. Md. Saifur Rahman
Deputy Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Alexander von Humboldt (AvH) Post-Doctoral Fellow, TU Dresden, Germany

The Sustainable Development Goals (SDGs) – the agenda 2030 comprises 17 goals and 169 targets adopted by the United Nations in 2015. The development targets encompass all sectors and countries – from developed to developing – to bring transformative changes concerning economic, social, and environmental sustainability. Many countries have progressed towards achieving many dimensions of environmental sustainability – the development, however, does not address critical aspects like biodiversity conservation and rather represents socio-economic development (Zeng et al., 2020). However, environmental sustainability lies at the centre of sustainable development (ADB & UNEP, 2019). Scholars argue that to achieve environmental (including forest and climate change) goals and targets – such as SDGs 12 on Responsible Consumption and Production, 13 on Climate Action, 14 on Life below Water and 15 on Life on Land – requires political ownership and meaningful national policy responses (Hoff, 2018; Akenroye et al., 2018).

National policy responses include progress in policy development planning and intended outputs and effectiveness of policies under implementation. The changed policies can either bring substantive outputs to carry a greater impact on society or bring symbolic and ineffective procedural action without having an optimal impact on society (Howlett & Rayner, 2007; Rahman et al., 2016). Moreover, a study conducted by the United Nations Environment Program (UNEP, 2016) has shown that 86 of the 169 targets are directly or indirectly linked to addressing environmental challenges or underscore the critical role of natural resources and ecosystem services in human well-being and prosperity. That means the progress of SDGs' social and economic dimension relies on advancing the environmental targets of SDGs.

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Bangladesh has the mission to ensure a sustainable environment and forests by conserving ecosystems and biodiversity, controlling environmental pollution and addressing climate change. Out of 58 ministries/divisions, the MoEFCC is the 2nd largest actor as a lead ministry for implementing 24 indicators of 7 goals, co-lead in 9 other indicators and data provider for 42 indicators (BPC, 2018). Considering the significance of the MoEFCC's roles and contribution to the agenda 2030 of sustainable development, the ministry has prepared its National Action Plan (NAP) during 2018-2019 (MoEFCC, 2019). The plan customises the global targets and indicators to the national context. It consists of planned projects/ activities and policies for implementation defining the targeted period – 2020, 2025 and 2030 (ibid). Existing policies and programs of the 7th Five Year Plan were integrated with the NAP for implementation by 2020 (BPC, 2018). The plan emphasises that it will be a guiding document to measure and monitor progress. Therefore,

this study aimed to measure policy/project development and effectiveness of changed policies concerning respective environmental SDGs targeted for implementation by 2020 in the NAP, using policy planning and policy change concepts.

The analysis counted a higher percentage of underdeveloped policies (not aligned', 'not conceptualised' and 'not approved' in nature), which unfold a significant gap in the SDGs policy/project development. The majority of innovative and technical project concepts related to data generation and management, technological capacity development and institutional strengthening, critical management of important ecosystems (i.e., protected areas, ecological critical areas, wet and dry lands), scientific study (e.g., assessment of indoor air pollution and health impacts, and climate change impacts) and technological innovation (e.g., management of degraded forests and valuation of ecosystem services) being labelled as underdeveloped policy. Major innovative nature of policy substances being detected as underdeveloped policy, which implies that SDGs policy failed to carry forward the creative concepts for implementation. In other words, the policy actors are still prioritising traditional policy substances with regard to policy planning and development attention.

The analysis finds some substantive policy action, especially for achieving SDG targets 15.2 and 15.5, to increase afforestation program through community participation and halting degradation of natural habitats and biodiversity loss for optimising sustainable forest management. We found, for instance, SDGs target 15.2 attracted the highest no. of project development, including the substantive one. However, at the same time, we observed the targets experienced a greater no. of ineffective policies (also valid for SDGs target 12.2), in which innovative implementation tools, techniques and knowledge generation is absent for conservation, sustainable forest management and efficient use of natural resources. Overall, we detected such ineffective policies – mostly related to research and innovative study and advancing technology and monitoring tools. For instance, screening temperature resilient and salt-tolerant tree species, assessing homestead forest resources, monitoring marine water quality, and conducting research and training require innovative technical instruments and knowledge.

We detected misdirected policies (e.g., SDGs target 15.1, 15.2, 15.4) planned to conserve biodiversity and sustainable management of forest ecosystems. In which biodiversity conservation, climate adaptation, and infrastructure and tourism development are designed as policy goals in the same project, which is incoherent to achieving the targeted outputs. The faulty design principles, including incoherent goal settings may demand frequent revisions of projects, leading to unnecessary delay and time and cost overrun. This statement is particularly valid as we often do not see any development project without being revised due to the incorrect goals and instrument settings. The underlying risk of these policies is that it creates implementation gaps. As a result, the emerging outputs might not have been translated into desired outcomes for the society (see Runhaar et al., 2018; Knill et al., 2012).

The analysis finds symbolic policy action in one instance for each SDG targets 13.3, 15.1, 15.2 and 15.4. One typical example of such symbolic action is that policy formulation occurs frequently, but it does not execute on the ground because of inappropriate goal setting and inadequate implementation means. We found, for example, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) formulated the "Bangladesh Forest, Environment and

Climate Change Country Investment Plan" first of its kind, with the help of consultants and government counterparts. However, policy action says that neither the policy goals are set appropriately, nor the national policy actors are willing to invest resources for its implementation. In consequence, the policy prescriptions remain completely unexecuted. We also detected failed policy action regarding forest management in the Chittagong Hill Tracts. Due to the acute implementation problems, such as persisting land tenure conflict and lack of regulatory solutions, the state institutions might not reach the policy goals of increasing forest coverage and biodiversity conservation.

Therefore, SDG policy action might fail unless and until the critical policy problems are solved. Droopiness of the policy actors for policy execution and avoiding risky games can lead to unsustainable development solutions. Such symbolic action can instigate only the procedural functions and formalities of governing instruments and mechanisms. It can be used as a politic to maintain the status quo across the policy actors and sectors. Hence, policy actors should step forward with critical, innovative solutions altering their traditional one-size-fits-all development approaches to gain optimal policy outputs and create a more significant impact on society. The ministry seems to focus more on forest issue elements in terms of development attention than on climate change and the environment. Therefore, the sustainable development feat underpins a symbiotic and mutually reinforcing arrangement but substantive policy action encompassing all forest, environment, and climate change sectors.

References:

Akenroye, T. O., Nygård, H. M., & Eyo, A. (2018). Towards implementation of sustainable development goals (SDG) in developing nations: A useful funding framework. International Area Studies Review, 21(1), 3-8.

Asian Development Bank (ADB) & United Nations Environment Program (UNEP), (2019). Strengthening the environmental dimensions of the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific. Manila, Philippines, DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.22617/TIM190002-2.

Hoff H. (2018) Integrated SDG Implementation—How a Cross-Scale (Vertical) and Cross-Regional Nexus Approach Can Complement Cross-Sectoral (Horizontal) Integration. In: Hülsmann S., Ardakanian R. (eds) Managing Water, Soil and Waste Resources to Achieve Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75163-4_7

Howlett, M., & Rayner, J. (2007). Design principles for policy mixes: Cohesion and coherence in 'new governance arrangements'. Policy and Society, 26(4), 1-18.

Knill, C., Schulze, K., & Tosun, J. (2012). Regulatory policy outputs and impacts: Exploring a complex relationship. Regulation & Governance, 6(4), 427–444.

MoEFCC, (2019). Action Plan for the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) Aligning to 7th Five Year Plan (2016-2020) and Beyond. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Rahman, MS, Sadath, MN, & Giessen, L. (2016). Foreign donors driving policy change in recipient countries: Three decades of development aid towards community-based forest policy in Bangladesh. Forest Policy and Economics , 68 , 39-53.

Runhaar, H., Wilk, B., Persson, Å., Uittenbroek, C., & Wamsler, C. (2018). Mainstreaming climate adaptation: taking stock about "what works" from empirical research worldwide. Regional environmental change, 18(4), 1201-1210.

Zeng, Y., Maxwell, S., Runting, R. K., Venter, O., Watson, J. E., & Carrasco, L. R. (2020). Environmental destruction not avoided with the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability, 3(10), 795-798.

LALMAI BOTANICAL GARDEN (LBG) AT A GLANCE

Imran Ahmed
Conservator of Forests
Dhaka Social Forest Circle

Vision: Native plants and plant diversity is valued and preserved while providing recreation and a continuous environmental education to a broad audience.

Mission: To stem the loss of plant diversity by maintaining the botanical garden that sustains a wide variety of plant collections, educate people of about the values of local flora and biodiversity, and serve the purpose of recreation.

The Context: The Botanical Garden at Lalmai Hill Areas at Koatbari, Cumilla was established in 2015 with a broad objective to conserve plant diversity of Lalmai Hills with providing recreation and a continuous environmental education to a broad audience. The present Botanical Garden is situated at 24 no. ward of Cumilla City Corporation area near Cumilla University & Moynamoti Archeological zoo. It has 16.81acre of area. About 100 indigenous rare and endangered tree species are planted here. One Cactus and one orchid house is there where variety of cactus and orchids are available. All natural trees, herbs and shrubs are conserved here. Different types of grasses are planted here. One lake is constructed at LBG for aquatic resources.

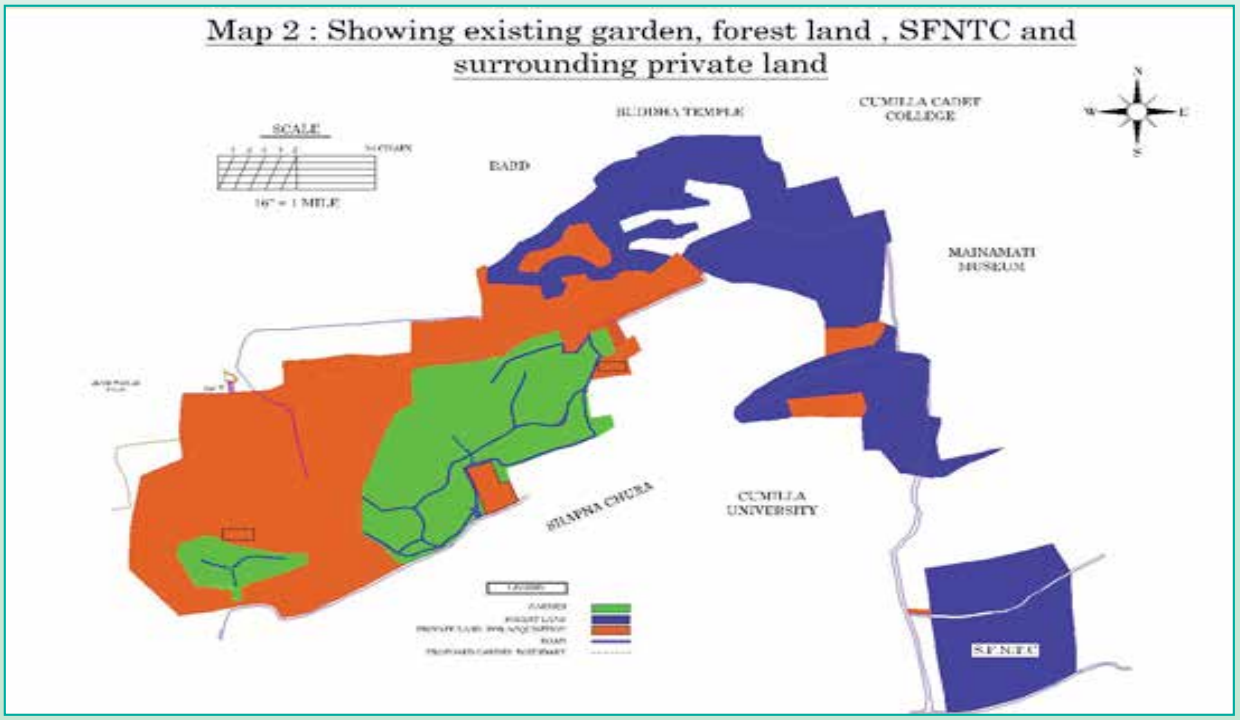

In addition to existing botanical garden, adjacent of the botanical garden, Kotbari Range Office compound with 6.77 acre of sal forest, Kotbari SFNTC having 9.30 acre area have some recreation facilities and used by the visitors. There are about 17.00 acre forest patches of natural sal and participatory plantations around the present Botanical Garden; those are also separated by private land holdings. The sections of the Garden and patches of forest land can be connected by acquisition of private land. Considering situations acquisition of 30.00 acre of private land is proposed for the expansion of the Botanical Garden. Inclusion of Kotbari Range Office area, SFNTC, existing sal and forest plantations and acquisition of private land as connectivity what will make a Garden of an area of about 80.00 acre.

Key Strategies with Rationales and Planned Activities: Considering the position of existing garden scope of further expansion into a regional garden with objectives to conserve local plant diversity and develop public awareness following Six Strategies with 34 planned activities are proposed in this Master Plan.

Strategy1: Expansion of the Botanical Garden at Lalmai Hill Areas

Planned Activities

1. Inclusion of existing natural sal patches of Kotbari Range Office and forest plantations adjacent to present Botanical Garden.
2. Private land acquisition for connecting two separate sections of the existing Botanical Garden and forest lands under plantations.
3. Landscape development.

Strategy2: Infrastructure and visitor' facilities development

Planned Activities

1. Area demarcation and boundary wall construction.
2. Development of vehicle parking area.
3. Construction and development of internal foot trails.
4. Construction and development of electricity distribution lines.
5. Sinking of water pumps and construction and development of water distribution lines in the existing Botanical Garden and newly extended areas.
6. Drainage and construction of pucca drains.
7. Construction of nursery sheds.
8. Construction of propagation sheds and mist chambers.
9. Construction of indoor plant house including ferns.
10. Construction of visitors' information centre at the main entrance gate and a colorful fountain in the Rose Garden.
11. Construction of Nature Interpretation Centre and Forest Museum.
12. Construction of visitors' sheds with display boards.
13. Construction of visitors' toilets and wash blocks.

14. Construction of environment friendly rock benches.
15. Construction of indication signages, Dos and Don'ts.
16. Repairing and further development of existing lake

Strategy 3: Plant collection, acquisition, preservation and garden development

Planned Activities

1. Planting programmes for Botanical Garden development following different thematic sections
2. Plant collection, acquisition and procurement of propagules.
3. Replenishment planting of newly included forest plantations with indigenous tree species.
4. Establishment of local wild guava (Psidium guineense) conservation areas.
5. Species reintroduction programmes.

Strategy 4: Botanical Garden management

Planned Activities

1. Recruitment and deployment of necessary staff
2. Horticultural activities and maintenance of collections
3. Management of records
4. Periodical review and adjustment of activities.

Strategy 5: Environmental interpretation and education

Planned Activities

1. Training programmes of both BFD staff as well as students and local people on awareness about nature conservation; botanical garden management and phyto-sanitary measures.
2. Printing and publication of pictorial guides, brochures leaflets (in collaboration with BFRI and universities).
3. Arrange different observance days.

Strategy 6: Future development

Planned Activities

1. Development of the next revised plan.
2. Procurement of consultants for developing the revised plan
3. Approval of the revised plan.

Networking and Partnerships: Development of networking and partnership with Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Bangladesh National Botanical Garden, Mirpur; Bangladesh Forest Research Institute, Chittagong; Institute of Forestry and Environmental Science, Chattagram University; Bangladesh Agricultural University Botanical Garden and Bangladesh Agricultural University Germplasm Centre.

List of species planted at LBG.

Main Entrance of LBG.

Wild Guava (Psidium guineense)

Jarul plantation and natural Bamboo clams.

Rose garden at LBG entrance.

High officials are visiting LBG.

স্বর্গের ফুল পারিজাত

ড. সানজিদা মুবাশ্‌শারা
অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৫

মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে
আকুল প্রাণে পারিজাত মালা সুগন্ধ হানে

পারিজাত ফুল আসলে কোনটিকে বলবো? শব্দটির আর্থ হল স্বর্গের ফুল বা স্বর্গীয় ফুল। অনেক জায়গায় শিউলি ফুলকে পারিজাত ফুল বলা হয়েছে। আবার আমাদের কবি সাহিত্যিকরা বসন্তের আগুন রঙা মান্দার ফুলকে পারিজাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন জায়গা বিশেষে। তবে আমার বিবেচনায় স্বর্গের ফুল হিসেবে শিউলির আবেদন বেশী গ্রহণযোগ্য। লক্ষনীয় বিষয় হল, ফুলটি প্রথম বৃক্ষ শাখা হতে মাটিতে পড়ে এবং পরবর্তীতে মাটি থেকে কুড়িয়ে পুজার অর্ঘ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ দেবতার দানে দেবতাকে তুষ্ট করা হয়। এছাড়াও মৃদু সুঘ্রান, শ্বেত শুভ্র রসালো পাপড়ি ও গাঢ় কমলা বোটার এ ফুলটিতে স্বর্গীয় আবহ ফুটে থাকে অনেক বেশী । বাড়ীর আঙিনায় ও সমাধিব উপর শিউলি গাছ চিরন্তন বাংলার শ্বাশত চিত্র। পবিত্রতার স্বারক এই শিউলি নজরুলের কবিতায় প্রতিয়মান হয়েছে -

আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কন-
কাঁদবে কুঠীর অঙ্গন।
শিউলি ঢাকা মোর সমাধি পড়বে মনে উঠবে কাঁদি।

শরৎকালে ক্ষনস্থায়ী ফুলটি রাতের বেলা ফুটেই ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে সবুজ ঘাসে বা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুলের বিছানা সাজিয়ে মনোরম এক দৃশ্য সৃষ্টি করে। শেষ রাতে এর সুগন্ধ বহু দূর ছড়িয়ে পড়ে। Nycthanthaceae পরিবারভূক্ত এ উদ্ভিদটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম হল Nycthanthes arbortristis যার অর্থ রাতের বিষাদিনী তরু - সুর্যের সাথে যার আজন্ম আড়ি। হিন্দু পৌরানিক কাহিনী ও গ্রীক মিথে একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায় এর সম্পর্কে। নাগরাজ কন্যা, পারিজাতক ও সূর্যদেবের গভীর প্রনয়নে এক পর্যায়ে সূর্যদেব অন্য নারীতে আসক্ত হলে দুঃখ আভিমানে দেহ ত্যাগ করেন পারিজাতক। রাজ কন্যার চিতার ছাই থেকে রাতের অন্ধকারে শাখায় শাখায় সাদা পবিত্র ফুল শোভিত হয়ে জন্ম নেয় একটি বৃক্ষ। সূর্যের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা অথবা অভিমান ও দুঃখে সূর্য ওঠার আগেই এ পুষ্প মাটিতে ঝরে পড়ে। এভাবেই ফুলটি স্বর্গীয় ফুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

শিউলি বা শেফালী ফুল কোথা থেকে এসেছে জানি না তবে কালিদাসের কাব্যে এ ফুলের উল্লেখ আছে তাই এ প্রাচীন ফুলটি এ উপমহাদেশেরই ফুল। মাঝারী ধরনের গাছটি অনুকুল পরিবেশে মোটামুটি অনেক দিন বাঁচে, এর পাতা খসখসে, কিনারা খাজ কাঁটা, উপরের পিঠ গাঢ় সবুজ, নীচটা সাদাটে। ,শিউলির পাতার রস খুব তেতো কিন্তু পুষ্টিগুনে ভরপুর ও ভেষজগুন সম্পন্ন তাই কবিরাজরা ঔষধ তৈরীতে বহুকাল ধরে ব্যবহার করে আসছে এ পাতার রস। ঠান্ডা জ্বর বা বসা কফ সহজে নিরাময় করে এ পাতার রস। এছাড়া কৃমি, খুশকী, পিও কমাতে ও আমবাতে সুফল পাওয়া যায় এ পাতার রস খেলে। এটি বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী। অন্য দিকে বাংলা সাহিত্যে, কবিতা, গান বা চিত্র শিল্পে বিশেষ স্থান আছে এ শিউলি ফুলের।

লিখন তোমার বিনি সুতার শিউলি ফুলের মালা
বানী সে তার সোনায় ছোঁওয়া আরুন আলোয় ঢালা
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরনে-

রবীন্দ্র কাব্যের এ শিহরণ আর নজরুলের "শিউলি মালা" নাটকে শিউলি ফুলের মালা সম্পর্কে অনবদ্য সংলাপ 'এ মালা প্রিয়ার নয়, পুজারিণীর' কিংবা 'এ মালা জলের, অন্য কারো নয়' ্ইত্যাদি থেকে শিউলি ফুল পূজার নৈবেদ্য হিসেবে প্রতিভাষিত হয়।

অপর দিকে বসন্তে কৃষ্ণচুড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে আগুন ঝরায় যে ফুল তাকেও স্বর্গীয় ফুল হিসেবে অস্বীকার করার উপায় নেই। কথিত আছে, দেবতারা অমরত্ব লাভের আশায় অমৃতের সন্ধানে সমুদ্র মন্থণ শেষে ধন্বন্তরি যখন অমৃত ভান্ড হাতে উঠে এসেছিলেন তখন সাথে নানাবিধ মনি-মানিক্যে, ঐরাবত ও পারিজাত বৃক্ষও উঠেছিল। ইন্দ্র এই পারিজাত বৃক্ষকে অমরাবতীর বাগানে শোভা বর্ধক হিসেবে রোপন করে। এছাড়া কাব্য -গানে, গল্প-উপন্যাসে এর মুগ্ধতার কথা এসেছে ঘুরে ফিরে। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন -

পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ
ইন্দ্রপুরীর কোন রমনীর বাসর প্রদীপ জ্বালো।।

আর নজরুলের গানে আছে -

আনো নন্দন হতে পারিজাত কেশর
তীর্থ-সলিল ভরি মঙ্গল হেম-ঝারি

গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম Erythrina Variegata ইংরেজিতে বলে ইন্ডিয়ান কোরাল ট্রি। পারিজাত হল আদুরে নাম, প্রচলিত নাম মান্দার বা মাদার। এটি Papilionaceae পরিবার ভূক্ত। স্বর্গ থেকে এলেও এটিকে ভারতীয় উপমহাদেশের গাছ ধরা হয়। এর শাখা প্রশাখা ধুসর রঙের এবং কাঁটা বিশিষ্ট, পাতা খুবই পাতলা,পালকের ন্যায় প্রশস্ত, ত্রিভূজাকৃতির শিরাযুক্ত। ডাল থেক বেশ লম্বা পাতার ডাঁটা দুপাশে দুটি ও মাঝখানে একটি মোট তিনটি পাতা নিয়ে বেড়ে উঠে। শীতের শুরুতে পাতা ঝরতে শুরু করে আর বসন্তে পাতাহীন গাছে আগুন ঝরা লাল রঙের ফুলের আবির্ভাব গাছটিকে বহু দূর থেকে সহজে চিনিয়ে দেয়। একটি দন্ডে অনেক গুলো ফুল থরে থরে সাজানো থাকে এবং গোড়ার দিক থেকে ফুটতে ফুটতে আগার দিকে যায়। এ ফুলের চোখ ধাঁধানো রঙ ফাগুনের শুরুতে আকাশে রক্তাভা ছড়িয়ে দলে দলে গুচ্ছ গুচ্ছ আমাদের চারপাশকে নেশাগ্র¯' করে রাখে । রবীন্দ্রনাথে বসন্তের গানে তাই এসেছে-

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে
পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা, পারুল, পলাশ
পারিজাতের বুকে পরে----

আর নজরুল বলেছেন - পরো কুন্তলে, ধরো অঞ্চলে

অমলিন প্রেম পারিজাত

আমাদের গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে অতি পরিচিত এই পুষ্প বৃক্ষটি ঝড়-ঝঞ্চা প্রতিরোধে সক্ষম বিধায় উপকুলবর্তী এলাকায় রোপন করা যায়। এছাড়া নির্মল সৌন্দর্যের জন্য মান্দার গাছ পার্কে, রাস্তার ধারে, বাগানে লাগানো উচিৎ। গাছটি দ্রুত বাড়ে এবং ছেটে দিলে দ্রুত নতুন ডাল গজায়। তাই এটি গ্রামে জ্বালানী কাঠের একটি বড় উৎস। খনার বচন "শুনরে বাপু চাষার পো, সুপারি বাগে মান্দার রো। মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে, ফল বাড়ে,ঝটপট করে" এর কৃষিবান্ধব ভূমিকা

উল্লেখ করে।আর সবশেষ কথা হল- পারিজাতের ভেষজ গুন অনেক। শিশুদের রিকেট রোগে, ক্রিমিতে, মেয়েলী রোগে, জ্বরে, আমাশয়ে মান্দারের বহুল ব্যবহার প্রচলিত।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাখি ফুলকেও কেউ কেউ পারিজাত বলেছেন। তবে বলে বেশী সুবিধা করতে পারেননি বোধ হয় কারন এর পক্ষে তেমন জোরালো কোন যুক্তি খুঁজে পাই নি। এ ফুলটিও ফাগুন মাসে ফোটে । পাখির লেজ ও পাখার মত এর কচি পাতা তাই এর এমন মজার নামকরন। ইংরেজিতে বলে ইৎড়হিবধ, বৈজ্ঞানিক নাম Brownea coccinea, গোত্র সিসেলপিনিয়েসি। এর আর একটি কাব্বিক নাম লোহিতাভ। থোকা থোকা লাল ফুল গাছের অগ্রভাগে ফোটে এবং প্রশাখাগুলি ফুলের ভারে নীচে নেমে আসে। রাস্তার পাশে এই চিরহরিৎ ছোট বৃক্ষ লাগালে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। গাছ ঘন ছায়া দেয় আর গুচ্ছবদ্ধ পুষ্পভারে শাখা প্রশাখা সুদৃশ্য হয়ে থাকে বিধায় এই বৃক্ষের জন প্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও আরও চারটি স্বর্গ বৃক্ষের নাম পাওয়া যায়-অর্ক, চন্দন, কল্পবৃক্ষ ও সন্তানক (দেবদারু)।

পরিশেষে বলতে হয়, স্বর্গের ফুল হোক অথবা মর্ত্যেই ফুটুক এ সকল পুষ্পবৃক্ষ প্রকৃতির নির্মল উপহার। তাই মনোমুগ্ধকর অপরূপ আমাদের সকলেই অতি প্রিয় এ পুষ্প বৃক্ষকে হারিয়ে ফেলা যাবেনা। পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসত হবে। বৃক্ষরোপন, সামাজিক বণায়ন, বৃক্ষমেলা, পুষ্প বা বৃক্ষ সমগ্রী প্রদর্শন, আলোচনা অনুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যপারে মনোযোগী হতে হবে।

STATE OF URBAN FORESTRY IN BANGLADESH

Dr.Md. Zahidur Rahman Miah
Director
National Botanical Garden, Mirpur, Dhaka

State of Urban Forestry Plant Species:

Dhaka city is now belonging to the family of world mega cities. Currently, the mega city has a population of about 12.5 million which is increasing at a rate of around 5% annually compared with the national average of 2.1% (BBS, 2011; Haq, 2006).The Local Government (City Corporation) Amendment Act (2011) divided Dhaka City Corporation (DCC) as Dhaka South City Corporation (DSCC) and Dhaka North City Corporation (DNCC) on 4 December 2011.Cities are dynamic for their ever changing land uses. This is particularly is true for mega city Dhaka and other major cities in Bangladesh. Once, trees were seen in plenty in major cities even in Dhaka. But with the time growing of urbanization native trees are decreasing and some decorative shrubs and small trees are introducing for aesthetic purposes. Plant selection is still dependent on the choice of city dwellers and other agencies without considering scientific arboricultural consideration. The seedlings and saplings belonging to trees, flowers, fruits sold by nurserymen are sometimes not up to the standard. Still plant species diversities (See Appendices: 1) are found in Dhaka and other major cities.

Luckily Bangladesh has been blessed with seasonal flower trees that are conducive for roadsides. As a part of the beautification project with Dhaka North City Corporation has chosen trees that ensured green cover throughout the year and confirmed seasonal flowers flourishing and blooming in the roadside trees. It also planted Krishnochura, Jarul, Shonaloo, Kodom and Hijol, Tomal around water bodies. These native trees are able to amaze passers-by with their glorious hues of yellow, red and purple, while leaving a lasting impression on the foreign visitors about the natural beauty of Dhaka. Recently many shrubs and small trees (See Appendices: 2) are used for decoration in the streets and Picture: 1 Gardens by City Corporation and others throughout the major cities.

Safeda plantation are seen at the Khulna city

Coconut trees are seen in plenty at the Barishal City

Plantation on the road divider at the Rajshahi city

Trimmed Trees with green lawn in the National Botanical Garden fascinate tourists

Trimmed Golden Dewdrop plants and Nageswar plants create a extra attraction in the frontal view of a commercial complex

Eucalyptus plants in straight line allures somebody easily. It is sometimes seen in the official compound.

Existing policies and legal scenario of urban forestry:

Urban forestry and urban greening is one of the most substantial factors for sustainable urban development, which can contribute towards good quality of life and sound environment. Dhaka, the capital of Bangladesh once renowned for its green resources (Some maps are showed in the Appendices.3). Unfortunately recent times the Dhaka is losing its greeneries very rapidly.

Table1. Loss of green areas in Dhaka (1975-2005)

Year	Loss of Green Area (Hectares)	Rate of Green Loss
1975	18,626	-
1988	14,818	20.4%
1999	12,966	12.5%
2005	10,009	22.8%

Source: Byomkeshet al., 2012

Chapter IX of the Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 contains trees, parks, garden and forests. According to the law, the City Corporation plant trees on public streets and other public places within the City and take all such steps as may be necessary for the plantation and protection of trees on such streets and places. The Corporation may, in the prescribed manner and with the previous sanction of the Government, frame and enforce an Arboriculture plan (Rule 126).

The Corporation may, and if so required by the Government shall, lay out and maintain within the City such public gardens as may be necessary for the recreation and convenience of the public, and such public gardens shall be maintained and administered in such manner as the by-laws may provide. For every public garden, there shall be framed and enforced, in the prescribed manner, a Garden Development Plan which shall provide for the development and improvement of the garden (Rule 127).

The Corporation may provide and maintain within the City such open spaces as may be necessary for the convenience of the public and such spaces shall be grassed, hedged, planted and equipped with such amenities and in such manner as the by-laws may provide(Rules 128)

The Corporation may, in the prescribed manner, frame and enforce Forest Plans providing for the improvement, development and exploitation of forests and plant, maintain and work forests in accordance with such plans (Rule 129)

According to Dhaka city structure plan 1995-2015 it is necessary to augmenting of city open space and securing the future open space although there have no specific policy which can support sustainable livelihood.

Well planned and well managed green areas are managed green areas are essential for environmental and high quality life for Dhaka city dwellers. Dhaka North and South City Corporation should rethink about these issues and necessary actions need to be taken.

Constraints for Urban Forestry:

- Loss of green space is continuous as cities expand; available growing space is limited in city centers. This problem is compounded by pressure to convert green space, parks, etc. into building sites.
- Inadequate space is allowed for the root system.
- Poor soil is used when planting specimens
- Incorrect and neglected staking leads to bark damage.
- Larger, more mature trees are often used to provide scale and a sense of establishment to a scheme. These trees grow more slowly and do not thrive in alien soils whilst smaller specimens can adapt more readily to existing conditions.
- Lack of information on the urban tree species tolerance to environmental constraints.
- Poor tree selection which leads to problems in the future and poor nursery stock and failure of post care
- Limited genetic diversity
- Too few communities have working tree inventories and very few have urban forest tree inventories and very few have urban forest management plans.
- Lack of public awareness about the benefit of healthy urban forests.
- Poor tree care practices by citizen and organizations.

Steps to improve urban forestry:

Still there are ample opportunities to augmentation of the greeneries in Dhaka and major cities by conserving the existing green areas (e.g. parks, gardens, playgrounds etc.), increasing roadside plantation, promoting homestead and rooftop gardening and by initiating afforestation and nursery activities. Urban population in the major cities of most of the developing countries is increasing rapidly, which consequently creating huge pressure on the existing green resources or green spaces and Dhaka city is not an exception in this regard. Moreover, improper and poor urban planning is worsening the situation

day by day. According to study it is revealed that Dhaka is losing its existing greeneries or green spaces enormously however, still there are ample possibilities to the City Corporation authority, RAJUK (Capital Development Authority), urban planners and local inhabitants to enhance the urban greening in the city that can sustain the existing life of the urban population. The following actions need to increase the urban greenery for aesthetic purposes and safer microclimatic environment for city dwellers.

- By conserving existing green areas/spaces
- Tagging the urban trees by RFID (radio-frequency identification) Tags for monitoring of timber adulteration and tree identification.
- By increasing roadside plantation
- By promoting homestead and rooftop gardening
- By initiating afforestation and nursery activities
- Promote homestead gardening and social or community forestry in peri-urban areas
- Augmentation linkage between city corporation authorities and forest department. Forest department has experience over urban forestation. In 1993-1994 Forest extension division raised plantation in the many parts of Dhaka city like cantonment area.
- Promote creation of citizen forests
- Formulate urban forest policy
- Formulate proper law and competent authority
- Recognition of green infrastructure values
- Develop linkage among stakeholders like Real State Association, Architectural Association
- Ensure proper permission for tree removal from urban area
- Expanded employee expertise and shared maintenance responsibility

Inserted chips by axe in the stem of a tree.

Monitoring inserted chips by RFID Reader.

Fig.1 Embedded RFID tags is being scanned by RFID Reader.

References:

BBS, 2011. National population census 2001: preliminary report. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka.

Byomkesh, T., Nakagoshi, N. and Dewan, A.M. 2012. Urbanization and green space dynamics in Greater Dhaka, Bangladesh.

Landscape Ecol. Eng., 8:45–58.

Haq, K.A. 2006.Water Management in Dhaka. Water Resources Development, 22(2): 291–311.

Appendix: 1

Local Name	Scientific Name	Trees found in the cities
Mehogoni	Swetenia macrophylla	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Akashmoni	Acacia auriculiformis	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Minjiri	Cassia siamea	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Lambu	Dysoxylum procerum	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Kamalgach	Eucalyptus camaldulensis	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
EpilEpil	Leucaena leucocephala	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Kadam	Anthocephalus cadamba	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Debdaru	Polyalathia longifolia	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Tetul	Tamarindus indica	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Segun	Tectona grandis	Dhaka,Sylhet,Rajshahi,Rangpur
Arjun	Terminalia arjuna	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Bohera	Terminalia bellirica	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Horitoki	Terminalia chebula	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Katbadam	Terminalia catappa	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Lohakath	Xylia dolabriformis	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Champa	Michelia champaca	Chittagong, Sylhet
Bel	Aegel marmelos	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Kathal	Artocarpus heterophyllus	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Deua	Artocarpus lacucha	Chittagong, Sylhet, Dhaka
Bilimbi	Averrhoea bilimbi	Chittagong, Dhaka, Sylhet
Chalta	Dillenia indica	Barisal, Chittagong, Dhaka,
Gab	Diospyros peregrina	Barisal, Chittagong, Dhaka,
Jalpai	Elaeocarpustectorius	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Kawphal	Garcinia cowa	Chittagong, Barisal
Ashfal	Nephelium longana	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Kadbel	Limonia acidissima	Khulna
Amloki	Phyllanthus embelica	Dhaka, Mymensingh, Chittagong
Kul	Zizyphus mauritiana	Dhaka, Chittagong, Khulna
Am	Mangifera indica	Rajshahi, Dhaka, Chittagong, Rangpur, Mymensingh, Khulna
Peyara	Psidium guajava	Dhaka, Barisal, Rangpur
Safeda	Manilkara zapota	Khulna, Barisal
Agar	Aquillaria malaccensis	Sylhet, Chittagong

Local Name	Scientific Name	Trees found in the cities
Hijal	Barringtonia acutangula	Sylhet, Barisal
Kanchan	Bauhinia purpurea	Dhaka,Mymensingh,Rajshahi,Barisal
Palash	Butea monosperma	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Simul	Bombax ceiba	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Botolbrass	Callistemon citrinus	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Sonalu	Cassia fistula	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Bonsonalu	Cassia nodosa	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Jhaw	Casuarina littoria	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Naglingom	Couroupita guianensis	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Krisnachura	Delonix regia	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Mandar	Erythrina variegata	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Jhuribot	Ficus bengalensis	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Aswatha	Ficusreligiosa	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Jarulcheri	Lagestroemiaindica	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Jarul	Lagestroemiaspeciosa	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Nageswar	Mesua ferrea	Dhaka, Sylhet, Chittagong
Sadarongon	Ixora pavetta	Dhaka
Kamini	Murraya paniculata	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Bokul	Mimusops elengi	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Kanakchura	Peltophorum pterocarpum	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Katgolap	Plumeria alba	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Weeping Debdaru	Polyalthia longifolia	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Panthopadop	Ravenala madagascariensis	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Asokh	Saraca indica	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Ticoma	Tecoma gaudichaudii	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Khejur	Phoenix sylvestris	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Bon Khejur	Caryota urens	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Tal	Borassus flabellifer	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Botol Palm	Roystonea regia	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Supari	Areca catechu	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal
Garjan	Diptercarpus turbinatus	Dhaka, Sylhet
Telsur	Hopea adorata	Dhaka, Sylhet
Neem	Azadirachta indica	Dhaka, Sylhet, Rajshahi, Rangpur, Barisal

Appendix: 2

Local Name	Scientific Name	Family
HoludKatamehedi	Duranta erecta	Verbenaceae
LailyMojnu	Excoecaria bicolor	Euphorbiaceae
Lalpata	Euphorbia pulcherrima	Euphorbiaceae
Lantana	Lantana camera	Verbenaceae
Variegated Kasava	Manihot esculenta	Euphorbiaceae
Musenda	Mussaenda erythrophylla	Rubiaceae
Berachita	Pedilanthus tithymaloides	Euphorbiaceae
KhatoTagor	Tabenaemontana divaricata	Apocynaceae
Koilash	Plectranthuss cutellariodes	Lemiaceae
Rokto Rongon	Ixora duffi	Rubiaceae
HoludRongon	Ixora lutea	Rubiaceae
Australian Rose	Hibiscus rosa-chinensis	Malvaceae
Galphimia	Galphimia gracilis	Malpighiaceae
GolapiSibjot	Acalypha hispida	Euphorbiaceae
Iodinpata	Alternanthera sanuinolenta	Amaranthaceae
DelowarPatabahar	Codiaeum varigatum	Euphorbiaceae
Lalsalu	Euphorbia cotinofolia	Euphorbiaceae
Baganbilash	Bougainvillea perviana	Nyctaginaceae
Golden sower	Pyrostegia venusta	Bignoniaceae
Madhobilata	Quisqualis densiflora	Combretaceae
Nilparul	Saritaea magnifica	Bignoniaceae
Nillata	Thunbergia grandiflora	Acanthaceae
Basorlata	Thunbergia mysorensis	Acanthaceae
Sohaglata	Vernonia elaeagnifolia	Asteraceae
Timeful	Portuaca grandiflora	Portulaceae
Dipti	Salvia splendens	Lamiaceae
Pitunia palm	Pritcharrdia pacifica	Arecaceae

Appendix 3: Notable green areas in Dhaka City

Fig.Chandrima Uddayn

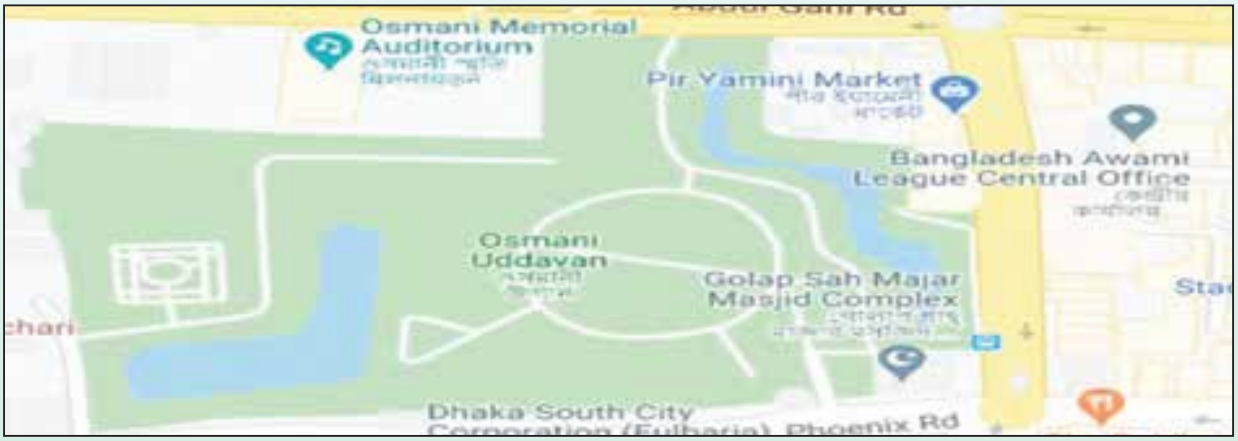

Fig: Usmani Uddan

Fig: Ramna Park

Fig. National Botanical Garden

Fig. Baldah Garden

নীরব ঘাতক বায়ু দূষণ

ড. মর্জিনা বেগম
অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশগত দূষণের যে নানামুখী দিক রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের বায়ু দূষণ নিয়ে অনেক বেশী উদ্বিগ্নতার যথেষ্ট কারণ আছে। বায়ু দূষণ একটি মানবসৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যার অন্যতম ধরণ, যদিও এই বায়ু দূষণের পেছনে প্রাকৃতিক অবক্ষয়েরও সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। World Air Quality report by IQ Air-২০২১ অনুযায়ী, ঢাকা পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বাধিক দূষিত বায়ুর নগরে উপনীত হয়েছে, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের রাজধানী দিল্লী দখল করে আছে প্রথম স্থানের তকমা। Green Peace and Air Visual Research Organization নামক গবেষণা সংস্থা মনে করে - প্রতি বছর প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষের অকাল মৃত্যুঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে, শুধুমাত্র বায়ুদূষণের কারণে যার ৪ মিলিয়নের অধিক ঘটে থাকে শুধুমাত্র এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। বিশ্বব্যাপী শুষ্ক মৌসুমের দেশসমূহ তুলনামূলকভাবে শীতপ্রধান দেশের তুলনায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। অধিকন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এশিয়া অঞ্চলের উপর অধিক। International Atomic Energy Agency (IAEA) মনে করে, শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের বায়ু দূষণের মাত্রা সর্বোচ্চ।

বর্ণিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, জাতিসংঘ কর্তৃক বায়ু দূষণকে ইতোমধ্যেই নীরব হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। World Population Review-2019 এর তথ্য মতে, ঢাকা মহানগরের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ২০ মিলিয়ন এর অধিক। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (বাপা) এর দাবী অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরের আনুমানিক ৯০ শতাংশ জনগণ মূলতঃ ধূলা-বালি জনিত তীব্র বায়ুদূষণে আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২১, তথ্যমতে, ঢাকায় হৃদরোগ এবং বিভিন্ন বায়ুদূষণ জনিত রোগে মৃত্যুহার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা মতে, বাতাসে লেড (Lead) এর উপস্থিতি রক্তস্বল্পতা, কিডনি জনিত সমস্যা এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধন করে, এমনকি শিশুদের শিখন ক্ষমতা হ্রাস করে। জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যাবহার জনিত অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ শ্বাসযন্ত্র এবং মৃত্যুহার ও অসুস্থতা ঝুঁকি বাড়ায়, যেখানে বাংলাদেশে এখনও তিন-চতুর্থাংশ জনগণ রান্নার কাজে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যাবহার করে।

বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদন অনুসারে, ঢাকা মহানগরে যত্রতত্র রাস্তা খনন এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্মুক্ত নির্মাণ কাজই মূলতঃ এই ধূলা-বালি জনিত বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। যদিও, বাংলাদেশে বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে ইটভাটা ও যানবাহন কর্তৃক নির্গত কার্বন ও সালফার - যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC) বর্তমানে বাংলাদেশের আকাশে সৃষ্ট ধোঁয়ার চাদরে জড়িয়ে থাকা বিষাক্ত উপাদানসমূহ চিহ্নিত করার জন্য জোর আলোকপাত করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, ঢাকার বায়ু দূষণে শুধুমাত্র পরিবহণ খাতের ভূমিকাই ১৬ শতাংশ। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রায় ৮০০০ ইটভাটা রয়েছে, যার মধ্যে আনুমানিক ৫৩০ টির অবস্থান শুধুমাত্র এই ঢাকা মহানগর ও এর পারিপার্শ্বিক এলাকাতে।

"বাংলাদেশ নির্মল বায়ু আইন-২০১৯" শীর্ষক আইনের খসড়ায় বায়ু দূষণকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা ও বিভিন্ন মেয়াদে সর্বোচ্চ দশ বছরের জেল-এর বিধান রেখে প্রস্তাব করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সকল উৎসসমূহ হতে বায়ু দূষণের প্রক্রিয়া তৈরী হচ্ছে সে সকল স্থাপনা ও যানবাহন পরিচালনার অনুমোদনকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর জবাবদিহিতার বিষয়টি আমলে নেয়া আগে প্রয়োজন। "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" এবং "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত)আইন, ২০১০" - এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, বায়ু দূষণকারী শিল্প স্থাপনা ও যানবাহনের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ, তারা বিষয়টি কিভাবে বাস্তবায়ন করছে? যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ঢাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু ইটভাটার লাইসেন্স বাতিলসহ নির্ধারিত পরিমান টাকা জরিমানা করা হয়েছে। Bangladesh National Ambient Air Quality Standard (BNAAQS), বাতাসে বিষাক্ত উপাদানের মাত্রা কমাতে কাজ করে যাচ্ছে এবং সফলভাবে লেডের উপস্থিতি বহুলাংশে কমাতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" এর ১২ নং ধারা সংশোধন করে বলা হয়, "মহাপরিচালকের নিকট হইতে, বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।" আর এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শিল্প হিসেবে ইটভাটাও রয়েছে। তাহলে সবার আগে প্রশ্ন আসে, ছাড়পত্র ছাড়া ইটভাটাগুলো তার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে? অনুরূপভাবে, যখন তদারককারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐ সকল ইটভাটা সমূহকে জরিমানা করছে তারপর কি সেই ইটভাটা সমূহ তাদের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখছে, নাকি রাখছে না? সেই বিষয় সমূহের তদারকি চলমান থাকা জরুরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইট প্রস্তুত ও ভাটা (নিয়ন্ত্রন) আইন ২০১৩, লঙ্ঘন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি, আবাসস্থল, চাষযোগ্য জমি ইত্যাদির আশেপাশে ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। এই ইটভাটাই ব্যবহৃত মূল কাঁচামাল (মাটি) আসছে আশেপাশের কৃষি জমি থেকে। কৃষি জমির মালিকগন বুঝে অথবা না বুঝে অর্থের মোহে জমির উপরিভাগের প্রাকৃতিক উর্বরতা সম্পন্ন মাটি ইটভাটায় বিক্রি করে দিচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে জমিতে বিদ্যমান অবশিষ্ট মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা ফেরাতে সময় লাগছে প্রায় ১৩-১৪ বছর। আবার এই দীর্ঘ কালীন সময়ে ফসল এর উৎপাদন হ্রাস হচ্ছে, যা দেশব্যাপী উৎপাদিত ফসলের পরিমান ও অর্থনীতির জন্য হুমকি। জাতীয় ভুমি ব্যাবহার নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী, কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি কাটার বা এর ব্যবহারের কোন অনুমতি নাই। বরং এই নীতিমালার ৭ নম্বর ধারা ঃ ভূমি ও কৃষি উৎপাদন শীর্ষক শিরোনামে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "উর্বর কৃষি জমি যেখানে দুই বা ততোধিক ফসল ফলে বা এমন জমি যা এরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময়, তা কোন ক্রমেই অকৃষি কাজের জন্য, যেমন- ব্যক্তিমালিকানাধীন নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, ইটের ভাটা তৈরি ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যাবেনা। "এছাড়া নূতন ইটভাটা নির্মাণ করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি, এবং জেলা প্রশাসনের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কোনটিই ইটভাটার মালিকদের থাকেনা। যদিও ইট প্রস্তুত ও ভাটা (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০১৩ এ লাইসেন্স ব্যাতিত ইটপ্রস্তুত নিষিদ্ধ বিষয়ে উক্ত আইনের ৪নং ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, "আপাতত বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসক এর নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট প্রস্তুত করতে পারবেন না।" অনুরূপভাবে মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে একই আইনের ৫নং ধারার ১নং উপধারাই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, "আপাতত বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি জমি, পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।" সেই হিসেবে একদিকে যেমন স্থাপিত ইটভাটা গুলো অবৈধ বলে বিবেচিত, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় প্রশাসন কোনভাবেই অবৈধ ইটভাটাগুলোর নীরব কার্যক্রম পরিচালনার দায় এড়াতে পারেনা। অধিকন্তু বায়ু দূষণ রোধে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কয়েক স্তরের নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

পরিবেশ সুরক্ষায় যে ঢাকাবাসী খুব স্বস্তিতে নেই তার বড় উদাহরণ, যুক্তরাষ্ট্র এর Environmental Protection Agency (EPA) সূচকে পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ গত আট বছরে ৪০ ধাপ পিছিয়েছে, যার মূল কারণ ছিল বিপুল সংখ্যক জনগণের চাহিদার বিপরীতে, অপরিকল্পিত, অধিক মানহীন যানবাহন এর চলাচল এবং যানবাহন নির্গত কার্বন, সালফার ও কালো ধোঁয়া, এবং ঢাকা শহরের প্রায় সর্বত্র দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাহীন রাস্তা খনন ও ভবন নির্মাণ, এছাড়া অন্যান্য সেবা প্রদানে পরিবেশ এর উপাদানসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহার।

যান্ত্রিক জীবন আর উন্নয়নের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত আমরা নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের জালে জড়িয়ে যাচ্ছি। অদূরদর্শী চিন্তা-চেতনার পরিনামে অনিয়ন্ত্রিত বায়ু দূষণের ফলে আমরা প্রতি মুহূর্তে যে একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি, তাতে ভবিষ্যৎ অনেক স্বপ্ন-পূরণ অধরা রয়ে যাবেনাতো! বিশ্বব্যাপী শহরাঞ্চলের বায়ুর গুণগত মান সমুন্নত রাখতে সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, সকল সম্প্রদায়, এবং ব্যক্তি সকলে মিলে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। আমরা নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ করতে পারিনা; কিন্তু যে বায়ু থেকে আমরা নিঃশ্বাস নেই তার মান উন্নয়নের জন্য কিছু একটা করতে পারি। পরিবেশ এর স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় আমদেরকেই সচেতন ও উদ্যমী হতে হবে যা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ সমাজে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখবে।

ANTIDIABETIC, ANTIHYPERTENSIVE AND ANTICANCER PLANTS GYNURA (GYNURA PROCUMBENS (LOUR.) MERR.)

Md Golam Moula
Divisional Officer

Tanmoy Dey
Research Officer
Plantation Trial Unit Division, Bangladesh Forest Research Institute, Barishal

Introduction

Gynura procumbens (Lour.) Merr. is a medicinal plants commonly found in Tropical Asia countries (Tan et al. 2016). Traditionally it is widely used in different countries for the treatment of a wide variety of health ailment such as kidney discomfort, rheumatism, diabetes melitus, constipation and hypertension (Tan et al. 2016). It has been reported to exhibit antihypertensive, cardioprotective, antihyperglycemic, fertility enhancement, anticancer, antimicrobial, antioxidant, organ protective and anti-inflammatory activity (Tan et al. 2016).

Botany

The scientific name of Gynura is *Gynura procumbens* (Lour.) Merr. belong to the family Asteraceae. It is an evergreen perennial shrub (Iskander et al. 2002). Height is about 10-25 cm (Hew et al. 2013). *Gynura procumbens* is a twining vine, smooth, except peduncle, stems are fleshy (Tan et al. 2016), leaves are staked except the uppermost one, ovate, elliptic or lanceolate (Rahman and Asad, 2013) 3.5 to 8.0 cm long and 0.8 to 3.5 cm wide with somewhat entire or toothed margin. Flowering heads are panicled, narrow, yellow and 1 to 1.5 cm long. Involucral bracts are smooth and up to 6.00 mm long. Achenes are very small and smooth with very close and slender ribs.

Distribution

The genus Gynura consist of 40 species distributed in tropical Asia and Africa. *Gynura procumbens* is found in China, Thailand, Indonesia, Malaysia, Japan and Phillipines (Afroz et al. 2014).

Habitat

This is a very low maintenance, fast growing herb/vegetable that can be grown indoor and outdoor. *Gynura procumbens* loves moist soil and does well in full sun, partial sun, partial shade and filtered light. It is best grown in well draining, fertile soil that is kept moist at all times and semi-shade is preferred by the plant (Iskander et al. 2002).

Constituent

It contains different types of protein, alkaloids and volatile oils.

Properties

Leaves are considered as anti-hyperglycemic, anti-hyperlipidemic and anti-inflammatory.

Parts Used

Whole plants, leaves and shoots.

Uses

1. Culinary

In many Asian countries leaves are eaten fresh or cooked, added to salads or stand alone salad; used for sauces as flavoring.

2. Folk Ric

In Java it is used for kidney travels, in Malaysia for dysentery, in Thailand used as topical inflammation, rheumatism and viral ailments. Poultice used for rheumatic and general body pains. In Malaysia, a folk remedy for diabetic and hyperlipidemia.

3. Biological function/activity

I. Anti-inflammatory activities

Study of ethanol extract showed inflammatory activities. In Thai folk medicine *Gynura procumbens* is commonly used to treat inflammation (Wiart, 2006).

II. Anti-hypertensive and cardiovascular activity

Hypertension is a key risk factor for several cardiovascular disease and stroke (Lu et al. 2012 and Tan et. al. 2016). The administration of *Gynura procumbens* has been reported to result in significant lowering of systolic blood pressure and arterial pressure in hypertensive in rats (Tan et al. 2016). This plant was also shown to have positive effect on the cardiovascular system; reducing blood pressure by blocking calcium channels and inhibiting the angiotensin converting activity. This effect is also accomplished by the plants activation of the release of the nitric acid (a natural dilatory of blood vessel) and prostate glands that dilate blood vessel and inhibit platelet aggregation.

III. Anti-diabetic actvity

Gynura procumbens is commonly used for diabetes treatment in traditional medicine and its hypoglycemic effect has been reported in vivo studies (Tan et al. 2016). The effect of Gyunura procumbens treatment on insulin level has been investigated. It has been reported the stimulation of insulin secreting cell lives by *Gynura procumbens* (Tan et. al. 2016). It also found to exert an effect on glucose metabolism in liver (Tan et al. 2016). There has also been work examining the hypoglycemic effect of *Gynura procumbens* in combination with other herbal therapies (Tan et al. 2016). It has observed to achieve a stronger hypoglycemic effect of *Gynura procumbens* was used together with Azadirachta indica or Andrographis paniculata (Tan et al. 2016). The current evidence suggest the presence of bio-active principles which posses insulin mimetic properties in *Gynura procumbens* (Hassan et al. 2010; Tan et al. 2016). Simply the anti-diabetic effect may be medicated through the stimulation of glucose uptake and the potentiating of insulin action.

IV. Anticancer activity

Gyunura procumbens has long been used as traditional treatment for cancer such as leukemia, uterine and breast cancer (Augustina et al. 2006; Tan et al. 2016). This has promoted scientific exploration of the anti- tumor activity of *Gyunura procumbens* (Tan et al. 2016). The ethanolic

extract was also shown to be effective against carcinogenetic effect of 7, 12-dimethylbenz (a) acetrance on liver (Tan et al. 2016). *Gyunura procumbens* has been tested on osteosarcoma cell line. The treatment has resulted in inhibition of cell proliferation and was observed to supress the invasive and migratory abilities of the cancer cell *Gyunura procumbens* have also demonstrated its potential in preventing breast cancer. It was shown to cause effective suppression in proliferation of breast cancer and epithelial cells of mammary glands (Wang et al. 2013; Tan et al. 2016). Mechanistically *Gyunura procumbens* inhibits the initiation phase of carcinogenesis.

Fig: Nursery of *Gyunura procumbens* at Ramna, Dhaka

References

[1] S. Afroz, M. Z. Uddin, and M. A. Hassan, "Gynura nepalensis DC. (Asteraceae) - A new angiosperm record for Bangladesh," *Bangladesh J. Plant Taxon.,* vol. 21, no. 1, pp. 101–104, 2014, doi: 10.3329/bjpt.v21i1.19275.

[2] D. Agustina, W. Wasito, S. M. Haryana, and A. Supartinah, "Anticarcinogenesis effect of Gynura procumbens (Lour) Merr on tongue carcinogenesis in 4NQO-induced rat," *Dent. J. (Majalah Kedokt. Gigi),* vol. 39, no. 3, p. 126, 2006, doi: 10.20473/j.djmkg.v39.i3.p126-132.

[3] Z. Hassan, M. F. Yam, M. Ahmad, and A. P. M. Yusof, "Antidiabetic properties and mechanism of action of gynura procumbens water extract in streptozotocin-induced diabetic rats," *Molecules,* vol. 15, no. 12, pp. 9008–9023, 2010, doi: 10.3390/molecules15129008.

[4] C. Sen Hew, B. Y. Khoo, and L. H. Gam, "The Anti-Cancer Property of Proteins Extracted from *Gynura procumbens* (Lour.) Merr," *PLoS One,* vol. 8, no. 7, 2013, doi: 10.1371/journal.pone. 0068524.

[5] M. N. Iskander, Y. Song, I. M. Coupar, and W. Jiratchariyakul, "Antiinflammatory screening of the medicinal plant *Gynura procumbens*," *Plant Foods for Human Nutrition,* vol. 57, no. 3–4. pp. 233–244, 2002, doi: 10.1023/A:1021851230890.

[6] Y. L. Lu, C. Y. Chia, Y. W. Liu, and W. C. Hou, "Biological activities and applications of dioscorins,the major tuber storage proteins of yam," *Journal of Traditional and Complementary Medicine,* vol. 2, no. 1. pp. 41–46, 2012, doi: 10.1016/S2225-4110(16)30069-4.

[7] I. J. Biosci, A. F. M. M. Rahman, and S. Al Asad, "Chemical and biological investigations of the leaves of *Gynura procumbens*," *Int. J. Biosci.,* vol. 6655, pp. 36–43, 2013, doi: 10.12692/ijb/3.4.36-43.

[8] H. L. Tan, K. G. Chan, P. Pusparajah, L. H. Lee, and B. H. Goh, "*Gynura procumbens*: An overview of the biological activities," *Front. Pharmacol.,* vol. 7, no. MAR, 2016, doi: 10.3389/fphar.2016.00052.

[9] H. Wang, J. W. Zhou, D. H. Fu, Y. Zhou, W. Z. Cheng, and Z. L. Liu, "*Gynura procumbens* ethanolic extract suppresses osteosarcoma cell proliferation and metastasis in vitro," *Oncology Letters,* vol. 6, no. 1. pp. 113–117, 2013, doi: 10.3892/ol.2013.1315.

[10] C. Wiart and C. Wiart, *Medicinal Plants Classified in the Family Polygonaceae.* 2006.

SAFEGUARDS IN FORESTS MANAGEMENT OF BANGLADESH

Md. Shams Uddin
Academic and Research Coordination Specialist
USFS COMPASS program, Dhaka

Introduction

1. The importance of safeguards in forest management nowadays is growing. Safeguard simply means no harm to the environment and people. Safeguard emerged in the late 1980s and early 1990s as a transformation of the World Bank from lender to norm-setter. Initially, the Bank operated chiefly as a lender of funding for infrastructure projects. This changed in the 1980s. The Bank started to enact more robust environmental and social standards for its investment projects, which became known as Safeguards. Because of the absence of such standards before, the World Bank faced huge criticism from different communities. Civil society organizations (CSOs) became increasingly aware of the problematic effects like communities are displaced, waters are polluted, trees are cut, natural habitats are lost of World Bank activities. The Bank's problems are illustrated by the often-cited example of the Narmada dam in India. Its construction displaced more than 140,000 people affected the livelihoods of many more and sparked worldwide controversy. Then the World Bank introduced social and environmental management framework in 2016 to reduce adverse impacts on the environment and people from the Bank-supported project activities.
2. Subsequently other development agencies and the United Nations organizations introduced safeguards/standards to reduce the adverse impacts of development projects for the sake of the environment and people. International Fund for Agriculture Development (IFAD) introduced social, environmental and climate assessment procedures in 2017, ADP introduced safeguard policy statement in 2009, FAO introduced environmental and social management guideline in 2015, UNDP enacted social and environmental standards in 2014, USAID environmental compliance, etc. Social safeguard mostly covers indigenous people's, involuntary resettlement, grievance mechanisms and community consultation whereas environmental safeguard implies environmental assessment, natural habitats, pest management, and access to information.
3. Safeguard in forestry ensures the sustainability of forests management outcomes by protecting the environment and people from potential adverse impacts of forests management. Safeguard objectives include avoiding adverse impacts of projects on the environment and affected people, minimize, mitigate, and/or compensate for adverse project impacts on the environment and affected people when avoidance is impossible and develop the capacity to manage environmental and social risks of projects. This assessment will give an overview of current safeguards practices in forestry sector and potential safeguards issues that will enhance improved and sustainable forests management in Bangladesh.

Regulatory Safeguards In Forestry

4. The Government of Bangladesh (GOB) included a section (18A) in the Constitution which states that the "State will conserve and develop the environment for people and will ensure the conservation and security of forests, wildlife, wetlands, biodiversity and natural resources" in Section 12 of the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 2011 (Act XIV of 2011). This is a landmark safeguard to conserve forests, the environment and natural resources of the country. To comply with the constitutional obligations, various forests and environmental safeguard Acts, Policies and Rules have been developed. Most notable Acts included the Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012 which empowered the government to declare any area as Sanctuary, Community conservation area, Safari park, Eco-Park, Botanical garden, Wildlife reproduction center, Landscape zone, Buffer zone, Core zone in relation to wildlife and plant preservation, protection and their natural growth. As per provision to the Wildlife (Conservation and Security Act of 2012, BFD developed the Protected Area Management Rules in 2017 which underlined the importance of community participation in association with the various government agencies and civil societies in the form of co-management to conserve and preserve biodiversity and livelihoods of the forests dependent communities in and around the Protected Areas (PAs).

5. Moreover, the GOB by means of Forest Act 1927 formulated the Social Forestry Rules 2004, revised in 2011 emphasized to ensure peoples' participation while also assigned the management committee to conserve and proper maintenance of the social forestry plantations. Furthermore, the Environment Conservation Act, 1995 affirms prevention of any environmental degradation in forests, wetlands and Ecologically Critical Areas (ECAs). A gazette published in 2016 from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MOEFCC) declared a ban on felling from reserved and natural forests till 31 Dec 2022. The vision 2021, in the perspective plan of Bangladesh (2010-2021), sets national development priority as "growth with equity and social justice remains the overarching goal of our development strategy and will be achieved on a sustainable basis without damaging the environment." Bangladesh set 20 National Target in line with Aichi Biodiversity Targets 2020 and most of the target should be fulfilled by 2021. Some of the notable targets include, initiate implementation of a restoration plan for degraded ecosystems, especially, forest lands and wetlands;5% of terrestrial ecosystem (forests), 3% of inland wetlands and coastal ecosystems and 5% of the marine area will be under PAs or ECAs; mobilize financial resources towards accelerated implementation of targets and activities of updated National Biodiversity Strategy and Action Plan(NBSAP). Time is very short as we need to implement it by 2021.

Forestry Safeguards Activities

6. Bangladesh Forest Department (BFD) is mandated for forests and biodiversity conservation of the country. BFD introduced safeguards in forestry through World Bank-financed Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project (CRPARP) project since 2013. Then Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) project is incorporating social and environmental management frameworks to enhance social and environmental services and also to mitigate the adverse impacts of the project. The SUFAL project will try to avid

involuntary resettlement whenever possible, enhance or at least restore the livelihoods if affected local community people and improve the standards of living of the local vulnerable communities. Major social concern includes forests dependent communities may get loss of access or limited access to the traditional forest area and resources, loss of sources particularly fuelwood for livelihoods and daily income may decrease. Key environmental concern includes clearing planting sites, fertilizer, and pesticides, monoculture with exotic species. Different other forestry projects financed by the USAID and GIZ have also their own policy to safeguards forests and biodiversity of the country.

Social Forestry:

7. Forestry is a subsistence economy of forest-dependent communities in Bangladesh. Social forestry is one of the best examples of safeguards to the environment and people of Bangladesh. In social forestry practices, local people preferably, women are engaged from planning to benefits sharing after harvesting. At least 40%-75% shared benefits in the social forestry enjoyed by the local people. This plantation program is also creating local employment and providing timber, fuelwood, fodder, etc. to meet the local demand. Thus, social forestry helps in ameliorating local environmental conditions as well as upliftment of the socio-economic condition of the local people.

Protected Areas:

8. Protected Areas are the safeguards of biodiversity and wildlife habitats in Bangladesh. For safeguarding them, Bangladesh has already declared 24% of forest areas as Protected Areas. Total 6,25,675 hectares have been declared as Protected Area of which one marine protected area (1,73,800 ha), 2 special bio-diversity conservation area (222 ha.) and 42 forest Protected Areas (4,51, 653 ha.). BFD has also declared two vulture safe zone and established a Wildlife Crime Control Unit (WCCU) in Dhaka along with 04 WCCU at Chittagong, Khulna, Rajshahi, and Sylhet to combat wildlife crime across the country. Three wildlife rescue centers have also been established to rescue the stranded wild animal. All these initiatives will safeguard the Wildlife of Bangladesh.

Greenbelt in Coastal Areas

9. BFD has established more than 0.2 million hectares of mangrove plantation in coastal regions to establish coastal green belt along the coastline. The 'Sundarbans' and coastal plantation serve as safeguards to coastal people against natural calamities like cyclones and tidal surges.

Forests and Environment Day

10. For inclusive participation to tree plantation, every year BFD arranges tree fair every during the plantation season at Upazila, District and National level of the country. Now people buy seedlings from the local market along with daily necessities. BFD also encourages individual as well as institutions in tree plantation and conservation. Every year Honorable Prime Minister gives `the Prime Ministers Award' for tree plantation. Notably in remembrance of 30 lacks martyrs of the liberation war in 1971, BFD distributed 30 lakhs seedlings among the students in 2019 and in 2020, BFD will distribute 100 Lakhs (1 crore)

seedlings nationwide as a memory of "Mujib year 2020". All such initiatives will safeguard people and the environment of the country.

Grievance Redress Mechanism (GRM) in Forestry Sector

11. The Deputy Chief Conservator of Forests (DCCF), Planning Unit is the focal point of GRM. In addition, the Chief Conservator of Forests (CCF) receives regular grievance from all over Bangladesh. Then CCF send them to the concerned unit/wing/department for inquiries. After getting enquiring results, CCF gives punishment (if applicable) and shares the results with the complainer. Moreover, to mitigate irregularities, three management plan divisions and one monitoring unit are working for monitoring and evaluation of field forestry/plantation activities of BFD. Nevertheless, Deputy Chief Conservator of Forests (DCCF), Conservator of Forests (CF), Divisional Forest Officers (DFOs), and Assistant Chief Conservator (ACF) regularly supervise the forest and forestry activities. Importantly, BFD is nowadays preparing forest maps using satellite images to monitor forests conditions. In Protected Areas, Community Patrolling Groups (CPGs) are working to patrol forests in association with local forest guards. In the social forestry practices, beneficiaries in collaboration with the forest officials are responsible for monitoring and safeguarding the forest resources. Presently, forest crime has been reduced by introducing SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) patrolling in Sundarbans of Bangladesh.

Conclusion and Recommendations

12. For safeguarding forests, BFD needs to be capacitated with advanced forests management knowledge focused on participatory approaches or co-management of forest management. Participatory forests management training curricula to be incorporated at all levels of forestry institutions like forestry schools, college, BSc, and MSc as well as training institutions of BFD. The Protected Area Management Rules 2017 still not well consulted and discussed within field forestry staffs. Insufficient field staffs and some demotivated field staffs hinder participatory forests management in and around PAs and reserved forests. For safeguarding forests, it is essential to building a cadre of community-sensitive foresters skilled in co-management or participatory forests management at BFD. A high priority would be to create an institutional home for co-management at BFD headquarters. For institutionalization of co-management and PA Rules, an operational guideline for PA Rules is required for safeguarding the forests and biodiversity of Bangladesh.

13. More importantly, to safeguard forests and meeting up national and international targets, Chattragram Hill Tracts (CHTs) need to be brought under tree plantation with indigenous species to restore tree coverage and biodiversity. The CHTs contains about 38.2 percent of the total forest cover of Bangladesh which is almost out of management. Due to violent conflict between the GOB and the predominant tribal inhabitants of the CHT, there have been relatively few forest management activities undertaken in the past several decades. Since 2013, with USAID funding, implemented by the UNDP, the Chattogram Hill Tracts Watershed Co-Management Activity CHTWCA, has made meaningful progress toward building experience in forest management and bringing the BFD and tribal villagers together to work on restoring a relatively small area of upland watershed lands in the forest reserve. At the same time, the CHTWCA has helped tribal villages to improve management

of village common forests, small patches of natural forest managed by local communities for watershed and NTFPs. For successful restoration at CHTs need build relationships and trust between tribal administration and the BFD. For example, in the CHT, the Arannayk Foundation has been supporting Community Based Management (CBM) through grants to local NGOs who in turn support Community Based Organizations (CBOs) to conduct rehabilitation and sustainable use of forest lands, both on private lands and with Village Common Forests (VCF)-CHT. These CBOs now have a foundation of CHT Community Based Management (CBM) experience. Their input and experience complement the work of CHTWCA. Moreover, the government should take care of some major forests policy issues in CHTs include (i) trust building between the BFD and tribal people and institutions, (ii) finding appropriate co-management models for the CHT context, (iii) registration of village common forest, (iv) BFD acknowledgement of village common forests as outside of the forest estate and (v) reform and rationalization of CHT forest transit rules.

14. Investment from government revenue, development project and private sector is crucial for safeguarding forests in Bangladesh. BFD planning unit should have more skilled staffs for developing projects incorporating current global concepts of forests management. Private sector should be engaged for the restoration of degraded forests in partnership with BFD. Periodic forests and biodiversity monitoring using satellite imageries are important. Furthermore, develop and implement a forest monitoring, reporting and verification programme is important to safeguard forests and biodiversity of the country. BFD can take regular such technical projects to support them. The Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) technology as well as Community Patrolling Group (CPG) should be strengthened to halt forests encroachment, conversion of forests land to alternative uses and wildlife poaching and trafficking.

15. For social and environmental safeguards in the forestry sector, alien tree species should be discouraged or limited in the plantation. In some parts of Bangladesh, especially the northern part of Bangladesh, alien tree species have been introduced in crops land and homesteads. Now mass awareness programs should be strengthened to motivate people to native tree species in the plantation. In addition, for safeguarding coastal communities, the government should undertake more development project of afforestation along the coastline to protect coastal vulnerable communities from natural disasters like cyclones and tidal surges.

16. The government and community people should popularize the re-plantation of 3-trees (timber, fruits and medicinal) against cutting of one tree into consideration environment and livelihoods of the communities under the scope of social forestry and encouraging the communities for homestead plantation with indigenous multilayer trees like rain tree, coconut, and bamboos. Besides, forest land use planning is very important to ensure conservation, protection and production purposes of forests. It may be more effective in biodiverse Protected Areas (PAs) of Bangladesh.

17. Coordination between BFD and other government agencies, forest-dependent communities, local government representatives, non-state actors are needed to improve forests management and implement it effectively. Assisted natural regeneration should be given priority in the Hill and Sal forests. Moreover, restore and sustainably manage degraded and other marginal areas, including coastal areas and wetlands, under

climate-resilient, participatory afforestation, reforestation, rehabilitation and ecological restoration processes to increase carbon sequestration consistent with the production and distribution of co-benefits that contribute to safeguarding local community requirements. Support forest-dependent communities with alternative livelihood strategies and programmes that match local traditions and cultures.

18. To have a significant impact on resources conservation, Alternative Income Generating Activities (AIGAs) need to reach men and generate sufficient and sustainable income to compensate for the loss of natural resource-dependent revenue. AIGAs provide an excellent an entry point for engaging a community because they are appreciated and generate direct benefits, even if they are not enough to discourage all illicit extraction, they provide a foundation for involving communities in conservation awareness-raising, and community patrolling activities. For AIGAs, BFD should have clear objective to find alternate income sources for resource users including identify target resource users and understand their motivations and capacities, identify profitable, manageable AIGAs through the value chain and market assessments, prepare model business plans matching with finance and capacity-building, plan and undertake outcome-focused M&E, learning, and adaptive management.

19. Outreach and conservation awareness would help to build positive attitudes and behavior to reduce threats to biodiversity. It creates the opportunity to engage a diversity of stakeholders in jointly improving the understanding of the importance of biodiversity, develop positive attitudes for conservation and initiate action towards sustainable solutions for biodiversity conservation. Government and non-government organizations have successfully engaged in outreach and conservation initiatives including tree plantation campaigns; celebrating globally recognized biodiversity days (e.g., World Environment Day, World Forest Day, World Wildlife Day); organizing conservation awareness campaigns in schools; supporting interactive popular theatre (drama, songs); sponsoring forest visit programs for journalists, youth, students; and writing and publishing biodiversity related stories targeting radio, newspapers and TV. The use of social media such as Facebook, YouTube, Twitter, Instagram for scaling outreach is only just beginning to be capitalized upon.

20. An outreach and communication unit could be established at Forest Divisions comprised of the FD, the District Cultural Officer, the Education Officer and the Cultural Group representative. The working group would be tasked with reaching a consensus on the priority threats for forests and biodiversity and designing effective outreach and conservation awareness activities that target key stakeholders including students, women, youth, religious leaders, local elites, potential political leaders, business associations, clubs, social issue associations, community members and local journalists. Importantly, such outreach and conservation awareness programs must be coordinated with local government departments, civil society and non-government organizations (NGOs) to raise awareness of and support for wildlife and forest management rules and acts.

WILDLIFE FARMING: DOES IT REALLY HELP IN CONSERVATION?

Md. Modinul Ahsan, PhD
Biodiversity and Wildlife Biology Lead
USAID Ecosystems/Protibesh Activity, Chemonics International Inc.

Wildlife and its products possession is often seen as status symbol (!) in our society and there are so called “conservationists” in the society who suggest government for making policy for wildlife farming to reduce pressure on the wildlife of the forests and other ecosystems. Basically wild animals are considered superior because of their rarity and high expense. Because rare species are associated with status it increases the consumer’s willingness to pay, which further increases the demand and eventually add greed to avail species from the wild. Some species are already commercially bred to meet the high demand for their products and this is referred to as wildlife farming. It has also been argued that a legal trade in animal products can prevent poaching if the following criteria are realized:

i) The demand will be met by legitimate products and cannot increase as a result of legalization and increased accessibility,

ii) The legal supply will be a substitute for products retrieved from wild populations,

iii) A legal supply will be more cost-effective than illegal products and

iv) Laundering of illegal supplies under the cover of legal trade must be avoided. Wildlife farming is a completely unethical and cruel some as animals are kept in small enclosures, and suffers from malnutrition, inbreeding depression and stress. The present Wildlife farming form does not contribute and has never contributed to the conservation of any species. On the contrary, there is evidence to demonstrate that it harms wild populations and has an adverse effect on the ecosystem.

It is erroneously assumed that the wildlife farming is helpful in conservation but in the long run the wildlife farming can never help in wildlife conservation rather it helps in diminishing wildlife population for various negative effects which is proved by many conservationists. Some of those are mentioned below:

Wildlife Farming cannot meet the demand of wildlife and its parts

The wanting of most wildlife products by far exceeds what commercial breeding can currently or realistically offer. For instance, musk deer, Moschus spp., are bred in captivity to provide musk to the market in traditional medicine, yet farms are currently only capable to meet 0.3%–1.2% of

the demand, and it is considered unlikely that domestic demand will ever be met Similarly, despite the fact that 12,000 bears are held in Asian farms for the production of bile, demand has been increasing, and commercial trade is unlikely to become sustainable. The demand for rhino horn and subsequent poaching has increased as well, which has been attributed to human population growth and the increasing consumer market, the rapid growth of the Asian economy and greater income for most consumers, and the settlement of middleman traders in key source countries in Africa. The same has been observed for elephant ivory, for which demand has been increasing since 1990 concurrent with increasing economic wealth. Another major concern is that wildlife farming and legalized trade is likely to increase demand further.

Allowing trade in wildlife products will legitimize their consumption, counteract the ethical unacceptance of buying illegal wildlife products, and encourage more consumers to buy the products as it is now considered acceptable. It has been suggested that demand for wild tiger products will be unaffected if tiger farming is legalized, unless a stigma effect is enforced with a monopoly chapter. When farmed prices are kept high by a monopoly firm, they can prevent illegal products from entering the market. This would require regulatory restrictions, certified products, and monitoring by an outside certifier. However, wildlife farming is not a monopoly industry and is unlikely to become so in the future, and many wildlife industries are currently controlled by multiple criminal network. The farmed breeding of tigers has increased product availability in China, and tiger parts are now being used in a larger variety of medicines, as well as in wine. Because real-life examples of the economic impact of wildlife farming are scarce, conservationists have often relied on model-based approaches. It is most often predicted that, due to an imperfect self-regulating market, the demand for wildlife products will not be displaced by commercial breeding. Furthermore, demand is likely to increase, which will intensify the pressure on wild populations.

Legal supply cannot be a substitute for products retrieved from wild

The major problem is that the use of animal products is deep-rooted in many cultures, mainly for traditional medicines, which makes the industry difficult to eradicate. For instance, although many Asian countries have removed rhino horn from their traditional medicine pharmacopoeias as there is no scientific evidence for any medical value, the demand for rhino horn has not yet been declined. This shows that spiritual beliefs outweigh scientific reasoning, which is the underlying problem of the second criterion stating that farmed products should satisfy consumers' needs, thereby substituting for products retrieved from the wild. On the other hand, 71% of the consumers of tiger derivatives prefer wild over farmed products. Similarly, consumers of bear bile prefer wild over farmed products because of believed differences in medicinal effectiveness. As long as the consumers' preference for wild animal products remains, farmed products cannot offer a substitute, and poaching will remain a threat.

Consumer inclination on wildlife products is based on quality and taste, which is believed to be different between wild and farmed species. Wild meat or bush meat for instance, is very popular in Vietnam, and high demand has led to the overexploitation of wildlife. Some species are being captive bred to meet the demand for meat, including turtles, snakes, porcupines, and monkeys, yet with little success because farmed meat is considered inferior, as consumers claim it to be of lower quality and lesser taste. This causes the demand for wild animals to remain constant

despite the availability of farmed alternatives. This has been most apparent for Asian turtles, for which the nutritional properties of wild animals are believed to be much higher than those of captive-bred animals. As a result, the last remaining wild populations of many endangered turtle species are being exploited to the point of extinction. Similarly, the quantity of wild orchids on Asian markets was unaffected by the flood of farmed plants, as the preference for wild specimens remained persistent.

Recent survey on the demand for sturgeon caviar, consumers were asked to taste two caviars and indicate their preference: they were told that one originated from a rare species and one from a common one. Even though the caviars were identical, 70.2% of the consumers preferred the caviar of the rare species. The wild meat industry in Vietnam is also strongly associated with social status, and regular consumers are generally business people, finance professionals, and government officials. The result is an increase in the market price for endangered animals, which leads to greater efforts to exploit the last remaining individuals. This has also been the case for butterflies caught for decorative purposes in Papua New Guinea, for which the price paid directly relates to the rarity of the species.

The exotic pet industry also demonstrates that people will pay considerably more for rare animals. The price that bird collectors pay for rare parrots such as Hyacinth macaws, Anodorhynchus hyacinthinus, and Spix's Macaws, Caynopsitta spixii, went up to over US$ 20 000 after these species became extremely rare in the wild, further increasing poaching pressure. Two newly described reptiles (the turtle Chelodina mccordi and the gecko Goniurosaurus luii) were rapidly collected to near-extinction due to their rarity and willingness of eager pet owners to pay up to US$ 2000 for a single individual. Also in the trophy hunting industry rare animals are higher valued. In South Africa, hunters will pay up to 26% percent more for rare antelopessuch as sable, Hippotragus niger, than for common antelopes such as impala, Aepyceros melampus, or kudu, Tragelaphus strepsiceros. Consumer preference for rare species leads to the fear that if farmed animal products become easily accessible, consumers will change their interest and crave products from rarer animals. For instance, the demand for tiger parts has already shifted to snow leopards, Panthera uncia, and clouded leopards, Neofelis nebulosi.

Legal supply cannot be cost-effective

Unfortunately, it is rarely the case that breeding farms are more cost-efficient than poaching, due to feeding, housing and production costs. The main problems faced by wildlife farming are the animals' social behavior, energy requirements, reproductive rate, growth rate, and space requirements. These can be explained by means of some examples;

- Social behavior can become a problem when an animal is highly territorial and intolerant of other individuals in its close surroundings. However, captive or commercial breeding of wildlife rarely succeeds due to its complicated social structure, which makes wildlife farming non-viable;
- Energetic requirements of species can make them expensive to rear in captivity, which is mainly the case for carnivores and frugivores. Farming of bull frogs, Rana catesbeiana, in Indonesia was meant to uplift export production of frog legs and take the pressure off native species, but many farms closed down due to high maintenance costs;

- The reproductive and growth rates of animal are often too slow to produce meat or derivatives at an economically viable rate. Green pythons, Morelia viridis, for instance, are in high demand as pets. Because of their long reproductive cycle and the fact that they only turn green at a length of 65 cm, it is unlikely that they can be bred fast enough to meet the high demand. Captive breeding or sustainable harvesting has also been proposed for rhinos in Africa. However, rhinos rarely produce fertile offspring in captivity, only reach sexual adulthood between 6 and 8 years of age, and only have one young per litter. Additionally, horns of young adults grow by only 6 cm per year on average, and the rate even decreases with age. Although rhino horn harvesting could have economic benefits, it will never produce horn at a rate fast enough to meet the demand from Asia;
- A final problem faced by wildlife farmers is that the space requirements of many species cannot be met in captivity. Pangolins are hunted for their meat and although captive breeding could form an important tool to protect wild populations, their specialized behaviour and high dependence of natural ecosystems prevent successful farming. These examples show that commercial farming is not an option for many animals threatened by the wildlife trade.

When wildlife farming comes with several additional production costs, it can create imperfect competition in the market. For instance, to produce a kilogram of tiger bones in captivity is 50%–300% more expensive than to retrieve this from a poached tiger, which means that the illegal hunting of wild tigers will remain an attractive alternative. A comparison made for ivory prices revealed that legally harvested tusks were sold for approximately US$ 450 per kilogram, whilst illegal tusks were sold for only a third of that price. For the same reason, parrots are still illegally smuggled into the USA because they can be sold for less money than commercially bred birds. The high expense of wildlife farming raises the question whether the market in illegal animal products can be replaced.

Even if farmed products were to become cheaper in the future, there is a risk that competition with illegal suppliers will result in higher market prices and subsequently a higher poaching pressure. More importantly, the illegal market in wildlife products is controlled by a small numbers of traders and criminal groups who make high profits, and large numbers of poachers who earn comparatively little and have no influence on market prices. This means that fluctuations in market prices, even if they were to decrease, will have little impact on poachers, who often lack any other form of income. What a poacher receives for a dead tiger or rhino is unmatched by the income of any average job in the third world. For instance, an elephant tusk will bring in money comparable to 10 times the average annual income in poor African nations. Rhino poachers are normally paid a once-off amount that does not relate to the horn's value, size or mass and is therefore not directly influenced by market prices. So, even when wildlife farming is able to compete with the illegal trade, poachers will not have any motive to stop their activities. The money is simply too good, and the risks are relatively low.

Conclusion: Commercial farming and a legalized trade in farmed products will have the negative impact to what is desired for conservation. Prime reasons are the consumers' preference for wild products, the ongoing dependency on the wild population, and laundering of illegal products into the legal wildlife trade. Furthermore, wildlife farming could only work as a

conservation tool when the demand is not increased by the legal trade and when farming becomes more cost-efficient than illegal harvest which is very difficult to execute and for this reason we should never think about wildlife farming.

Adopted from

1. Tensen, L. 2016. Under what circumstances can wildlife farming benefit species conservation? Review Paper. *Global Ecology and Conservation* 6(2016) 286- 298. Molecular Zoology Laboratory, Department of Zoology, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa

2. URL: http://envietnam.org/index.php/news-blog/800-wildlife-farming-brings-profit- not-conservation.

ad

FORESTRY IN POVERTY ALLEVIATION AND CLIMATE CHANGE MITIGATION: VIEWING FROM INSTITUTIONAL FRAMEWORKS

Dr. Md. Nazmus Sadath
Professor, Forestry and Wood Technology Discipline, Khulna University

Poverty is still the challenge for the world to contain with, hence the first Goal of Sustainable Development Goals (SDG) is: No poverty. One of the Millennium Development Goals was also aimed at cutting extreme poverty and hunger worldwide in half by 2015. Present statistics still shows that around 11% of the world's population live in extreme poverty, about one in five persons in developing regions lives on less than US$1.25 per day. The SDG took the bold commitment to finish what was started through millennium development goal, and end poverty in all forms and dimensions by 2030. This involves targeting the most vulnerable, increasing access to basic resources and services, and supporting communities affected by conflict and climate change related disasters. Hence sustainable development is the solution to achieve the goal by 2030, where environmental aspects are of greater importance. Therefore a sustainably managed environment is a prerequisite for socio-economic development and poverty eradication where, natural environment supplies ecosystem goods and services that provide income, support job creation, poverty alleviation, contribute to safety nets and reduce inequity and vulnerability to stressed community. Climate change and natural disasters poses a threat to poverty eradication in the developing world as a great number of the worlds' most vulnerable and poorest citizens live in disaster prone countries. As global warming continues, the likelihood and severity of climate-related disasters are likely to increase affecting lives and livelihoods, hampering the development efforts and reversing gains made in poverty reduction. In this regard the environmental conservation and poverty eradication should go hand in hand. While talking sustainable environmental management and conservation, forest and forestry always take a key position in the discussion. In this context, the role of forests and forestry in poverty reduction and food security and climate change mitigation gained momentum.

People's dependency on the forest resources and services are very common phenomenon especially in the developing countries with the currently occurring population explosion. Millions of people having great variety of culture live in and around the forests in developing countries for their livelihood. Forests provide the important safety net for rural people to meet subsistence needs. Around one fourth of the world's population depend on the forest resources for mitigating their economic, social as well as environmental requirements. In most of the scenario these rural communities are living below the poverty line, where subsistence and survival is imperative than conservation. In addition to the local demand, the aspiration of countries economic development also creates stress to the forest ecosystems in the developing countries. Being a fast developing country, Bangladesh is also facing the dilemma of being caught between fast economic growth and environmental conservation. Due to different reason the deforestation and forest degradation rate is also an issue in Bangladesh. Overexploitation, encroachments, industrialization and

development project are the major drivers of deforestation in Bangladesh. Losing forest have a dual effect, 1) less forest resources for the forest dependent people and 2) more loss of carbon to atmosphere. In that regard sustainable management and conservation of forest resources is very important for poverty eradication and climate change mitigation.

In 21st century the major challenge for the forestry sector of Bangladesh is to provide livelihood opportunity to the forest people along with climate change mitigation and adaptation through forestry activity. The social forestry program of Bangladesh has been a success in both aspect like reclamation of encroached forest land and making benefit provision for the poor forest dependent participants. If we consider the famous pentagon approach of sustainable livelihood for a rural household, there are five capitals upon which their livelihood's sustainability depends; natural resource capital, social capital, physical capital, human resources capital and financial capital. The social forestry program directly contribute to three of these five capitals. For example: 45% cash benefit at the end of the rotation provide direct input to one poor household's financial capital, likewise the program also provide legal access rights to the natural resource capital and provision of beneficiaries committee at local level directly increase the social capital of local poor. Similarly Co-management of forest resources in protected areas of Bangladesh now provides in similar manner to the local forest people. Additionally the Co-management approach provided more opportunities for the local level organization and institution building for effective collaboration and decentralization forest governance. So, participatory decentralized forest policy program could be an ultimate solution for involving local people in forest protection and reducing deforestation and forest degradation along with sustainable livelihood security for the rural forest people.

Forests, when sustainably managed, can have a central role in climate change mitigation and adaptation. Forest plays a vital role in climate mitigation trough carbon sequestration and forest carbon stock conservation. In these regard the coastal afforestation program of Bangladesh has been playing a vital role. While increasing forest cover in newly formed coastal land, Bangladesh forest department has also taken initiative to conserve the existing carbon stock of its natural forests as the country has joined the UN REDD initiative. Countries first FREL report has been prepared and submitted. In recent times, the contribution of deforestation to the climate change regime has become important in the world as well as in Bangladesh. As per UNFCCC report 26.5% of Bangladesh's Carbon emission comes from landuse and forestry sector. In one hand Bangladesh forest sector has to stop deforestation and to do so, more community people active participation in forest conservation is imperative. On the other hand, if deforestation can be stopped and forest cover can be increased, then there is an opportunity of foreign finance through UN- REDD+ program. However, to able the opportunity, Bangladesh's REDD+ readiness is a prerequisite. Generally, the UN-REDD+ national program is designed in three phases –towards achievement of REDD+ readiness. Phase one involves the development of national strategies or action plan, policies and measures and capacity building; Phase two is the implementation of these plan policies and measures and Phase three being the result based and action and payment. Hence, forest governance is imperative for successful implementation of UN-REDD+ program in Bangladesh. A proper institutional framework is to be established for harnessing the potential opportunity of REDD+ program. Co-management of forest area in forest conservation could provide the local level institutional basis for harnessing REDD's

benefit. In that regard and governance through Co- management in the natural forest and protected areas is the most important issue. Such Forest governance challenges usually are somehow related to the stakeholders' interest and power relationship. In addition, they required policy framework for delineating meaningful authority to local people in terms of REDD framework has yet to be put in place. Additionally, it can be said that there has been a policy changes to assuring better forest governance through Co-management under the influence of international forestry regime influence. However, having the policy framework does not always ensure its proper implementation and attainment of policy goal/ outcome. In that regard it is imperative to have research on institutional framework for UN-REDD national program and policy implementation efficacy in Bangladesh forest sector. Therefore, local people involvement in forest governance in terms actor centered interest power relation needs to be evaluated now for the UN-REDD readiness in terms of result-based action approach. Hence, study on institutionalization of Co management of forest resource for Forest conservation is very important for the Countries climate mitigation and resilience strategy.

An effective framework characterized with efficient decentralized forest governance with meaningful local level stakeholder's participation for forest based climate change mitigation and adaptation is imperative for Bangladesh now. If we can deliver that model framework then it will contribute to food security, poverty alleviation, economic development, and sustainable land use, in the wider context of sustainable development along with survival of forest ecosystems and enhances their environmental, sociocultural and economic functions. It will both maximize forests' contribution to climate change mitigation and help forests and forest-dependent people to become more climate resilient.

DIVERSITY OF ANGIOSPERM FLORA OF KUAKATA NATIONAL PARK, PATUAKHALI DISTRICT, BANGLADESH

M. Azizar Rahaman, Md. Azizur Rahman and Mohammad Zashim Uddin
Sheikh Kamal Wildlife Center, Gazipur, Bangladesh Forest Department
University of Chittagong, Bangladesh, University of Dhaka, Bangladesh
Corresponding author: E-mail:alam027456@gmail.com

Abstract

The article mainly highlights the angiosperm diversity of Kuakata National Park (KNP) of Patuakhali district. Angiosperm diversity assessment in the park was conducted in between 2015 and 2016. A total of 265 plant species belonging to 75 families and 204 genera was identified from this National Park. For each plant species, scientific name, family, local name, habit and habitat were provided. Tree species of the park are represented by 89, shrubs by 45, herbs by 94, climbers by 31 and epiphytes by 6 species. In Magnoliopsida (dicots), Fabaceae is the largest family represented by 14 species, whereas in Liliopsida (monocots), Poaceae is the largest family represented by 13 species. The plant species recorded from the National Park were distributed in different habitats and maximum species were recorded in plantation areas(108) followed by homesteads (61),cultivated land(38), roadsides (35) and mangrove areas (23).The study has reported the presence of medicinal plants, wildlife supporting plants, exotics and invasive plants and rare plants in park. The presence of edible species in the National Park is very rare. The introduction of exotics species into the National Park has been accepted. As the presence of exotics in park, local flora will be faced great challenges in future for their existence. This article also focused conservation values, management concerns and some actions for conservation of angiosperm diversity in the National Park. The present angiosperm diversity assessment in the park is very preliminary and based on this sound conclusion cannot be made yet.

Key Words: Diversity, Angiosperm Flora, Kuakata National Park, Patuakhali District, Bangladesh

Introduction

Kuakata National Park(KNP) is the 12thdeclared National Park of Bangladesh and a part of the Reserved Forest of Patuakhali Coastal Forest Division. Initially it was declared as an Eco-Park in 2005. Later Kuakata Eco-Park was gazetted as a National Park in 2010 (Gazette notification of Ministry of Environment and Forests no. MoEF/Forest Section-2/02/National Park/10/2010/ 509 Dated: 24/10/2010 as per power given under the provisions of Article 23 (3) of the Bangladesh Wildlife (Preservation) (Amendment) Act 1974). It is situated in the southern part of Bangladesh under Kalapara *Upazila* of Patuakhali district and geographical location is in between including *21°49′16″*N and *90°07′11″*E.

The park is bordered by the Bay of Bengal to the east, south and west, the Andharmanik River and WAPDA embankment to the north. The National Park has an area of 1613 ha with Gangamati, Khajura and Kuakata forest beats on the seashore, comprises coastal mangrove plantations (BFD 2012).

Kuakata National Park enjoys tropical maritime climate characterized by high rain during monsoon. The average temperature of KNP ranges between 21.71°C to 29.41° C and average annual rainfall is about 2657 mm/year. The soil of the area consists of calcareous alluvium, acid phosphate soil, grey floodplain and grey piedmont soils. These soils are saline and the PH values are neutral to slightly alkaline. KNP frequently was affected several serious cyclones during last couples of years. The park area is experiencing rapid erosion mainly at the south and west parts and is more threatened due to regular sea wave actions (BFD 2006).

The diversity of plants is very much essential in shaping of human civilization in recent days. Unfortunately, such diversity has been eroding in alarming rate from the nature before evaluation and documentation. At the end of 19 th century the head of states from all over the world had realized this burning issue. In 1992 world leaders in Earth Summit in Rieo De Janerio formulated biodiversity conservation policy including agenda 21 which had also given importance on the documentation and sustainable utilization of traditional knowledge of plant diversity. After the convention the assessment works of plant diversity in different countries of the world is in progress (Uddin and Abiabdullah 2016). In case of Bangladesh angiosperm diversity assessment of different National Parks and Wildlife Sanctuaries had already been started (Khan et al. 1994, Rahman and Hassan 1995, Uddin et al. 1998, Uddin and Rahman 1999, Khan and Huq 2001, Uddin et al. 2011, Uddin and Hassan2004, 2010; Uddin et al. 2013, 2015, Sajib et al. 2015 and Uddin and Abiabdullah 2016). Literature review revealed that so far no work in available on the angiosperm diversity of Kuakata National Park. For the management of the park, baseline data on the angiosperm diversity are essential. In the present study an attempt was taken to achieve the following objectives: (a) to document the angiosperms diversity, (b) to highlights management concerns of the park and (c) to recommend some conservation actions for Kuakata National Park.

Materials and Methods

Extensive floristic survey had been conducted in different seasons of the year of 2015 and 2016(Hyland 1972, Balick et al. 1982 and Alexiades 1996). The study included plantation areas, mangrove areas, cultivated land, roadside and homestead areas. Particular efforts were given to find species of conservation concern including threatened and rare species. Sample size was determined using species area curve or species time curve following Goldsmith and Harrison (1976). Maximum identification of species was done in the field sites and rest of the specimens was collected and processed using standard herbarium techniques (Hyland 1972). Identification was done by consulting different Floras (Uddin and Hassan 2004, Siddiqui et al. 2007 and Ahmed et al. 2008a,2008b, 2009a, 2009b, 2009c, 2009dand 2009e).

The updated nomenclatures of the species are integrated by following Siddiqui *et al.*(2007) and Ahmed *et al.*(2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d and 2009e). Threatened categories of plants were confirmed with the help of Khan *et al.* (2001) and Ara *et al.* (2013). Some noxious

exotic plant species were also identified comparing with the reports of Hossain and Pasha (2004) and Akter and Zuberi (2009). Families were arranged according to Cronquist (1981). Voucher specimens are preserved at Sheikh Kamal Wildlife Center (SKWC), Bangladesh Forest Department.

Results and Discussion

A total of 265 plant species belonging to75 families and 204 genera was identified from the Kuakata National Park. For each plant species scientific name, local name, family, habit and habitat have been presented in Table 1. Among the families, Fabaceae, Poaceae, Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Moraceae, Solanaceae, Convolvulaceae, Asteraceae, Apocynaceae, Mimosaceae, Verbenaceae, Amaranthaceae, Cyperaceae, Acanthanceae and Zingiberaceae were found to be most common. By analyzing habit diversity it was found trees by 89, shrubs by 45, herbs by 94, climbers by 31 and epiphytes by 6 species. In Magnoliopsida (dicots), Fabaceae is the largest family represented by 14 species, whereas in Liliopsida (monocots), Poaceae is the largest family represented by 13 species. The plant species recorded from the National Park was scattered in different habitats. Among the habitats, maximum species were recorded in plantation areas (108) followed by homesteads (61), cultivated land (38), roadsides (35) and mangrove areas (23). Most of the plant species in the plantation areas, homesteads and roadsides were introduced by the forest department and local people. The number of edible plants was found minimum in the park.

During the study, much concentration was given in the following habitats: The mangrove plantations were developed all around the National Park. Each year the newly accreted lands facing to the sea were undertaken by the forest department for plantation programs. The top canopy in the mangrove was occupied by *Sonneratia apetala, S. caselaoris, Avicennia officinalis, Excoecaria agallocha and Bruguiera gymnorrhiza.* Besides few representations of *Heritiera fomes* and *Ceriops decandra* were also detected in the park. The forest ground was covered mainly by the seedlings of *Ex. agallocha, S. apetala and A. officinalis.* In the forest periphery, the bush forming dominant species were *Acanthus ilicifolius, Nypa fruticans* and *Ex. agallocha.* The ground near the intertidal zone was mainly dominated by *Pandanus foetidus, Phragmites karka and Saccharum spontaneum.* Most common climbers in the mangrove forest were *Derris scandens, D. trifolia, Ipomoea pes-caprae, Ichnocarpus frutescens* and *Desmodium heterocarpon.* Some members of sedge species including *Cyperus diformis* and *C. kyllingia* were observed in this zone. The banks of the tidal zone were dominated by a good number of tree species such as *Tamarix gallica,Pongamia pinnata, Barringtonia acutangula, Trewia nudiflora,Heritiera fomes, Nypa fruticans, Tamarindus indica, S. apetala, A. officinalis, S. caseolaris, Samanea saman, Albizia procera, Calophylum innophylum, Acacia nilotica, A. farnesiana, Casuarina equisetifolia and Rhizophora mucronata.*

One embankment was made on the north site of the National Park to protect Kuakata municipal area from high tidal surges. Besides, many small roads and trails made by encroachers and forest department, and some plantation areas also established inside National Park. Embankment, plantation areas, small roads and trails were planted by the forest department using a number of both native and exotic species. The remarkable species are Samanea

saman, Borassus flabelifer, Phoenix sylvestreis, Casuarina equisetifolia, Acacia nilotica A. farnesiana, A. auriculiformis, A. mangium, Eucalyptus camaldulensis, Albizia lebbeck, Artocarpus heterophyllus, Calophylum innophylum, Nerium indicum, Bauhinia purpurea, Delonix regia, Pongamia pinnata, Dalbergia sissoo, Ficus benghalensis, F. racemosa, Gmelina arborea, Terminalia arjuna, T. bellirica, T. chebula, Butea monosperma, Erythrina indica, Michelia champaca ,Swietenia mahagoni, Excoecaria agallocha, Cassia siamea and C. fistula. Some bushy plants were also found in this sides. The major species are Ricinus communis, Cajanus cajans, Cassia alata, Calotropis procera, Glycosmis pentaphylla, Clerodendrum viscosum, Datura metel, Hyptis suaveolens, Xanthium indicum, Solanum torvum, Ixora acuminate, Murraya koenigii and Ziziphus glabrata. Many climber species were also ornamented this sides. Most common species are Mikania cordata, Thunbergia fragrans, Pothos scandens, Hemidesmus indicus , Coccinia grandis , Dioscorea pentaphylla, Hodgsonia macrocarpa, Mucuna pruriens, Ficus pumila, Hedyotis scandens and Cuscuta reflexa.

In the Kuakata National Park, 383 encroachers have occupied of forest land and made homes. Each homestead was planted by a good number of tree species. The appearance of such homestead looks like a segment of mini forest. During our survey Moringa oleifera,Acacia nilotica, Aegle marmelose, Albizia lebbeck,Albizia procera, Samaneasaman, Anacardium occidentale, Annonareticulate, Borassus flabellifer,Anthocephalus cadamba,Aphanamixis polystachya, Areca catechu, Artocarpus chaplasha,Artocarpus heterophyllus, Averrhoa carambola,Azadirachta indica, Bambusa tulda, Citrus maxima, Cocos nucifera,Elaeocarpus robustus ,Ficus racemosa,Phoenix sylvestreis, Ziziphus mauritiana, Trewia nudiflora, Terminalia chebula, T. bellirica,Tamarindus indica, Syzygium cumini, Swietenia mahagoni, Spondias pinnata, Psidium guajava, Melia azederach, Mangifera indica, Lawsonia inermis, Erythrina indica and Diospyros malabarica were recorded.

Aside from plantation areas and homesteads, some areas are used as cultivated land. Local people and encroachers use such land ones in a year for rain fed aman rice cultivation. The most common plants recorded were Enhydra fluctuans, Eclipta alba, Centella asiatica, Blumea lacera, Tridax procumbe, Heliotropium indicum, Ludwigia repens, Oxalis corniculata, Echinochloa colonum, Oryza sativa, Panicum notatum, Setaria glauca and Bacopa monnieri and also a good number of sedges and grasses. In summer the land was sheltered by a number of herbaceous plants. Among them the common species were Xanthium indicum, Thysanolaena maxima, Ischaemum indicum, Echinochloa colonum, Sida acuta,Euphorbia hirta ,Kyllinga nemoralis, Fimbristylis dichotoma, Cyperus cyperoides, Commelina benghalensis, Blumea membranacea and Paspalum distichum. A rare occurrence of Typha elephantina (Hogla) and Phragmitis karka (Nol) was also recorded in the wetland.

The four species namely (Tamarix gallica, Calophylum inophylum, Typha elephantina and Phragmitis karka) were found to be rare in the National Park. To authenticate their status further comprehensive survey is needed. A good number of medicinal plants were identified which plays important role for the primary healthcare of local people in and around the National Park. Priority should be given for their conservation. The recorded common species in the National Park were *Adhatoda zeylanica*, *Andrographis paniculata, Achyranthes aspera, Phyllanthus emblica, Ocimum sanctum, Ricinus communis, Azadirachta indica , Aegle marmelos, Alstonia scholaris, Holarrhena antidysenterica, Sonneratia apetala, S. caseolaris, Nypa fruticans,*

Centella asiatica, Mangifera indica, Scoparia dulcis, Mikania cordata, Ipomoea fistolusa, Terminalia arjuna, T. chebula, T. belliricha, Cassia alata Diilenia indica, Cynodon dactylon , Colocasia esculenta and *Ficus racemosa.*

Exotics and invasive species are a component of total floristic composition of the National Park. Some exotics, such as *Acacia auriculiformis, A. mangium, Eucalyptus camaldulensis* and *Cassia siamea* were planted in the National Park area. Invasive species of the National Park were found to be *Eichhornia crassipes, Mikania cordata* (Refugee lota)*, Ipomoea fistulosa, Ageratum conyzoides, Croton bonplandianum* and *Xanthium indicum*. Such species are a challenge to the management of the plant diversity of the National Park. A good number of wildlife supporting plant species namely *Sonneratia apetala, S. caseolaris, Avicenneia alba, Ficus benghalensis, F. racemosa, F. virens, Phoenix sylvestreis, Syzygium cummuni, Butea monosperma, Artocarpus chaplasha* and *Tamarindus indica* was recorded from the National Park. Such species play an important role in conservation of biodiversity.

Based on observations and discussion with local people and foresters it is evident that erosion is major threat to the National Park. The south and west sides of the National Park are facing high erosion due to regular sea wave actions. The species planted there are *Acacia nilotica (Babla), A. farnesiana* (Khaia Babla)*, A. auriculiformis* (Akashmoni), *Pongamia pinnata* (Koroj)*, Barringtonia acutangula* (Hizol) and *Trewia nudiflora* (Pitali) all of which are fresh water enduring species. Initially such species were doing better in producing branches and canopy. But their root systems are poorly developed. During high tide period the wave actions made them uprooted easily. Mangrove species like *Sonneratia apetala* (Keora), *S. caseolaris* (Soila), *A. officinalis* (Baen) *and Ex. agallocha* (Gewa) were found to grow well in the intertidal zone because they have strong root systems and can survive with high wave action during rainy season. Facilities and man power of local forest department are not much adequate. Introduction of exotics by forest department is also visible. Grazing by buffalos in the mangrove forest areas, plantation areas and newly accreted lands were also observed.

With the purpose of management of the National Park local knowledge based policy is very essential. During the field trips we discussed with local forest personals, local elites and general people to find some clues for formulating recommendations. The suggestions which are made based on our visit experiences are: to undertake short term and long term management plans, to install geo-tube or geo-bag on the south and west sites for protecting forest degradation and soil erosion, to develop eco-tourism, to ensure security for tourist, to provide visitor use for educational, cultural and recreational purposes at a level which will not cause significant biological or ecological degradation to the biodiversity, to create the sources of fresh water both for human and wildlife, to establish watch towers to enjoy sun rises, sun sets and natural views, to record local knowledge from the elders about nature and adaptation and to record health care knowledge of local people, to create awareness programs about environment, biodiversity and wildlife, to accelerate plantation programs using local species, to provide risk allowance for the people who involved in forest management process, to increase capacity of forest and forest personals, to detect and remove invasive species, to avoid exotics in plantation programs, to arrange traditional knowledge based cultural program, to create traditional medicinal knowledge sharing programs, to relocate encroachers from the park, finally to ensure land ownership and forest territory using GIS map.

The present work on the assessment of angiosperm diversity in Kuakata National Park is the first attempt. The record of total 265 angiosperm species in the park is very preliminary. We expected more angiosperm species yet to be identified. It is not possible to give a concrete conclusion based on such preliminary results. Long term floristic survey is necessary to cover all the component of the angiosperms and also other group of plants.

Acknowledgements

Bangladesh Forest Department and local forest offices of Patuakhali Coastal Forest Division and Kuakata National Park are greatly acknowledged for financial support and facilities. The authors are also grateful to the Sheikh Kamal Wildlife Center of Bangladesh Forest Department for implementing research work.

References

Ahmed, Z.U.,Z.N.T. Begum, M. A.Hassan, M.Khondker, S.M.H.Kabir, M.Ahmad, A.T.A.Ahmed, A.K.A. Rahman and E.U.Haque (Eds).2008a.Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh, Vol.6. Angiosperms: Dicotyledons (Acanthaceae – Asteraceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-408.

Ahmed, Z.U., M.A.Hassan, Z.N.T.Begum, M. Khondker, S.M.H.Kabir,M. Ahmad, A.T.A.Ahmed,A.K.A.Rahman and E.U. Haque (Eds). 2008b. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh,Vol.12. Angiosperms: Monocotyledons (Orchidaceae – Zingiberaceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-552.

Ahmed, Z.U., M.A. Hassan, Z.N.T.Begum,M. Khondker, S.M.H. Kabir,M. Ahmad, A.T.A. Ahmed,A.K.A. Rahman and E.U. Haque (Eds).2009b. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh,Vol.7. Angiosperms: Dicotyledons (Balsaminaceae – Euphorbiaceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-546.

Ahmed, Z.U., M.A. Hassan, Z.N.T.Begum ,M. Khondker, S.M.H. Kabir,M. Ahmad, A.T.A. Ahmed,A.K.A. Rahman and E.U. Haque (Eds).2009c. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh,Vol.8. Angiosperms: Dicotyledons (Fabaceae –Lythraceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-478.

Ahmed, Z.U., M.A. Hassan, Z.N.T.Begum, M. Khondker, S.M.H. Kabir,M. Ahmad, A.T.A. Ahmed,A.K.A. Rahman and E.U. Haque (Eds).2009d. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh,Vol. 9. Angiosperms: Dicotyledons (Magnoliaceae – Punicaceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-488.

Ahmed, Z.U., M.A. Hassan, Z.N.T.Begum, M. Khondker, S.M.H. Kabir,M. Ahmad, A.T.A. Ahmed,A.K.A. Rahman and E.U. Haque (Eds).2009e. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh,Vol.10. Angiosperms: Dicotyledons (Ranunculaceae – Zygophyllaceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-580.

Ahmed, Z.U.,M. Khondker, Z.N.T. Begum, M.A. Hassan, S.M.H. Kabir,M. Ahmad, A.T.A. Ahmed and A.K.A.Rahman (Eds).2009a. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh,Vol. 4. Algae: Charophyta-Rhodophyta (Achnanthaceae– Vaucheriaceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-543.

Akter, A. and M.I. Zuberi.2009. Invasive alien species in northern Bangladesh: Identification, inventory and impacts. International journal of biodiversity and conservation.1(5): 129-134.

Alexiades, M.N.(Ed.).1996. Selected Guidelines for Ethno botanical Research: A Field Manual.The New York Botanical Garden, New York.

Ara, H.,B.Khan and S.N.Uddin (Eds.). 2013.Red data book of vascular plants of Bangladesh,Vol.2. Bangladesh National Herbarium, Dhaka, Bangladesh.p.280.

Balick, M.J.,A. B.Anderson and M. F.da Silva.1982. Plant taxonomy in Brazilian Amazonia: The state of systematic collection in regional herbaria. Brittonia 14: 463-477.

BFD,(Bangladesh Forest Department) 2006. Master plan of Kuakata Eco-Park.Bangladesh Forest Department, Agargaon, Dhaka, Bangladesh.pp.5-6.

BFD,(Bangladesh Forest Department)2012.State of Bangladesh's forest protected areas. IPAC and Bangladesh Forest Department, Agargaon, Dhaka, Bangladesh. 63.

Cronquist, A.1981.An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press, New York, p. 1262.

Goldsmith, F.B. and C.M. Harrison.1976.Description and analysis of vegetation .In: Champman SB (ed.). Methods in plant ecology. Blackwell, Oxford, pp. 85-155.

Hossain, M.K. and M.K.Pasha. 2004. An account of the exotic flora of Bangladesh. Journal of forestry and environment. 2: 99-115.

Hyland, B.P.M. 1972. A technique for collecting botanical specimens in rain forest. Flora Malesiana Bulletin. 26: 2038-2040.

Khan, M.S. and A.M.Huq. 2001. The vascular flora of Chunati Wildlife Sanctuary in south Chittagong, Bangladesh. Bangladesh J. Plant.Taxon.8(1): 47-64.

Khan, M.S., M.M. Rahman and M.M.Ali (eds.). 2001. Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh. Bangladesh National Herbarium. 179.

Khan, M.S.,M.M.Rahman,A.M.Huq, M.M.K Mia and M.A.Hassan.1994. Assessment of biodiversity of Teknaf game reserve in Bangladesh focusing on economically and ecologically important plants species. Bangladesh J. Plant.Taxon.1(1): 21-33.

Rahman, M.O. and M.A. Hassan.1995.Angiospermic flora of Bhawal Narional Park, Gazipur, Bangladesh.Bangladesh J. Plant Taxon.2(1&2): 47-79.

Sajib, N.H., S.B.Uddin and M.K. Pasha.2015. Angiospermic Plant Diversity Of Sandwip Island, Chittagong, Bangladesh.J.Asiat. Soc. Bangladesh, Sci. 41(2): 133-153.

Siddiqui, K.U., M.A.Islam,Z.U.Ahmed, Z.N.T Begum, M.A.Hassan,M.Khondker, M.M.Rahman, S.M.H Kabir, M.Ahmad,A.T.A Ahmed, A.K.A Rahman and E.U. Haque (Eds).2007. Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh.Vol.11. Angiosperms: Monocotyledons (Agavaceae -Najadaceae). Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 1-399.

Uddin, M.Z.,M.F.Alam, A.S.M.Rahman and M.A. Hassan.2011. Plant Biodiversity of Fashiakhali Wildlife Santuary, Bangladesh. Accepted for publication in First Bangladesh Forestry Congress Proceeding 2011.pp.129-141.

Uddin, S.B. and M.A. Rahman.1999. Angiospermic flora of Himchari National Park, Cox's Bazar, Bangladesh. J. Plant Taxon. 6(1): 31-68.

Uddin, M.Z. and M.A. Hassan.2010. Angiosperm diversity of Lawachara National Park (Bangladesh): a preliminary assessment. Bangladesh J. Plant Taxon.17 (1): 9-22.

Uddin, M.Z. and M.A. Hassan. 2004. Flora of Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary. IUCN Bangladesh Country Office, Dhaka, Bangladesh, pp.1-120.

Uddin, M.Z., M.F.Alam,M.A.Rahman and M.A. Hassan. 2013. Diversity in angiosperm flora of Teknaf Wildlife Sanctuary, Bangladesh. Bangladesh J. Plant Taxon.20(2): 145-162.

Uddin, S.N.,M.S.Khan, M.A. Hassan and M.K. Alam.1998. An annotated checklist of angiospermic flora of Sitapahar at Kaptai in Bangladesh. Bangladesh J. Plant Taxon.5(1): 13-46.

Uddin, M.Z., M.G.Kibria and M.A. Hassan. 2015. An assessment of angiosperm plant diversity of Nijhum Dweep (Island). J. Asiat. Soc. Bangladesh,Sci.41(1): 19-32.

Uddin,M.Z. and M.Abiabdullah. 2016. Taxonomic study on the angiosperms of Char Kukri Mukri Wildlife Sanctuary. J. Asiat. Soc. Bangladesh,Sci.42(2): 153-168.

অস্তিত্বের সংকটে হরিপুর চরের পাখি ঃ সংরক্ষণ উদ্যোগ অপরিহার্য

ফারিহা ইকবাল পাফিন
সেক্রেটারী, কিচির-মিচির, কুষ্টিয়া ও ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক, BBCF

ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারনে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বেশ সমৃদ্ধ, বিশেষ করে নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল ও উপকূল সংলগ্ন এলাকায়। দেশের বৃহত্তম নদী পদ্মার তীরঘেঁসে তার শাখা নদী গড়াই এর বুকে জেগে ওঠা হরিপুরের চরটি পাখি ও জীববৈচিত্র্যের এক আদর্শ আবাস। দেশীয় প্রজাতীর নানান পাখিদের সমাবেশে মৌসুমভেদে সমবেত হয় বৈচিত্র্যময় প্রজাতীর অতিথি ও পরিযায়ী সব পাখি। সব মিলে যেন এক পাখির রাজ্য পদ্মা-গড়াইয়ের বুকে হরিপুরের চর।

হিমালয় পর্বতমালা, কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা, আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালা দিয়ে বেষ্টিত হয়ে অনন্য ভূ-প্রকৃতি ধারণ করা দক্ষিণ এশিয়ার অংশ এবং হিমালয় থেকে বয়ে আনা পলিমাটি দিয়ে গঠিত Bengal Floodplain এর অংশ বাংলাদেশে পাখি-বৈচিত্র্য স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষনীয়। সাতশো'র অধিক প্রজাতির পাখির মাঝে একটি বৃহৎ অংশের দেখা মেলে এদেশের নদ-নদী সংলগ্ন চরাঞ্চলে ও সংলগ্ন এলাকায়। সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের মূল তিনটি নদীর অবক্ষেপণে ১৯৪৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ২,৯৭০ বর্গ কিলোমিটার নতুন চরাঞ্চলের তথা ভূখন্ডের জন্ম হয়েছে যার অধিকাংশই সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্র্যের ধারক। পদ্মা-গড়াই বিধৌত ঐতিহ্যবাহী জেলা কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে বয়ে চলা পদ্মানদীর শাখানদী গড়াইয়ের বয়ে আনা বালি-পলিতে ভরাট হয়ে, গড়াইয়ের উৎসমুখ থেকে শেখ রাসেল ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৩ কি.মি. দৈর্ঘ্যের একফালি হরিপুর চরের জন্ম।

ভূ-প্রকৃতিগত বিবেচনায়, হরিপুর চরও অন্যান্য চরের মতো ভাঙা-গড়ার বৈশিষ্ট্য লালন করে, যদিও বিগত কয়েক বছরে এর আকার আকৃতিতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। একটা সময়ে গড়াই নদী ছিলো ভয়াল দর্শন এক খরস্রোতা নদী। বর্ষায় গড়াই অতি তীব্র আকার ধারণ করতো। বর্ষা মৌসুমে পদ্মার ভাটির স্রোতের তোড়ে ভাঙাগড়া আর আংশিক জলমগ্নতার কারণে এখানে বহুকাল যাবৎ স্থায়ী জনপদ গড়ে ওঠা ও মানুষের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ হয়নি। ২০১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত হরিপুর চর সহজগম্য ছিলোনা, কুষ্টিয়া শহর থেকে নৌকাযোগে যাওয়াই ছিলো একমাত্র যাতায়াতের উপায়। অন্যদিকে, চরে একই সাথে আংশিক জলমগ্ন এলাকা, তার চাইতে কিছুটা উঁচু এলাকায় বিস্তৃত শুকনো ঘাসবন, একপাশে ঘাসহীন উন্মুক্ত বালুচর, শীতকালে নদীর পানি নেমে গেলে চারপাশে জেগে ওঠা শৈবাল আচ্ছাদিত এলাকা, এবং চরের চারপাশের বৃক্ষ, সব মিলিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলো এ হরিপুর চর। নিকটবর্তী ইট-কাঠের শহরের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেই এখানে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে বেঙ্গল ফক্স, সিভেট ক্যাট, জঙ্গল ক্যাট, বুনো খরগোশ, ইয়েলো লিজার্ডের মতো প্রাণী ছাড়াও শতাধিক প্রজাতির পাখি। শহরটি থেকে কেবল একটি নদীর ব্যবধানে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগত, যেখানে অবলীলায় গড়ে উঠেছে পাখি ও জীববৈচিত্র্যের এক নয়নাভীরাম নিরাপদ স্বর্গরাজ্য।

ঋতুভেদে একেক সময় এ চরের সৌন্দর্য একেক রকম। এখানে শীতকালে উত্তরের দেশগুলো থেকে আসা হাজারো পরিযায়ী এবং পান্থপরিযায়ী পাখিদের রঙ আগত শীতের মতোই চাকচিক্যময়, নান্দনীক, মনোলোভা। ভোরবেলায় সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বালি ঝিলমিল করে উঠলে, অগভীর পানিতে পা ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নানান ধরণের Stint, Sandpiper। ছোট ছোট ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে খঞ্জন পাখিরা লেজ দোলায়, রৌদ্র স্নান করে কয়েক হাজার বাবুবাটান, অতিথ্যে উদ্বেলিত হয় নানা জাতের অতিথি পাখিরা। তাদের শিকার করার জন্য তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নজর রাখে লম্বাপা তিসাবাজ, রাজকীয় ভঙ্গিমায় আকাশে ওড়ে Red-headed Falcon.

হরিপুর চরের আসল সবুজ রূপের আগমন শুরু হয় বসন্তের হাত ধরে। নব উত্থিত সবুজ ঘাসের চাদরে মোড়ানো চরের বুকে শিশু, অশ্বত্থ, বাবলা গাছের বনে সদ্য গজানো পাতা, সঙ্গে পুটুস ফুলের কুঁড়ির গোলাপি আভা আর সাদা গুঁড়গুঁড়ি ফুলে মৌমাছিদের অনুসরণ করে Bee-eater দের ঝাঁক জড়ো হয়। ভাঁটফুল আর আকন্দ ফুলের ঝোঁপে দেখা যায় মৌটুসীদের মেলা। শিমুল গাছগুলোতে কয়েক প্রজাতির শালিক, ধলাচোখ, বেনেবউ আর বুলবুলিদের মধু পানের মেলা বসে। ঝোপঝাড়ে পরিযায়ী মক্ষী ভুক পাখিদের কলতান শুনে মনে হয়, তাদের ফেরার সময় হয়ে এলেও যেন আরও ক'টাদিন এখানে কাটিয়ে যেতে চায়, যেমনি করে এ চর ছাড়তে মন চাইবেনা আপনারেও।

বর্ষাকালে গড়াই নদীর পূর্ণ যৌবন, সেই সাথে হরিপুর চরেরও। স্থানীয় পাখিদের জন্য এ সময়টা প্রণয় নিবেদন আর বাসা বাঁধার সময়। পদ্মার ওপাড় থেকে প্রিনা, কিস্টিকোলা পাখিরা বাসা বাঁধতে এখানে উড়ে আসে। পাশের গ্রামের বাঁশবাগান থেকে সকালে আর বিকেলে পালা করে ঘুরতে আসে প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের দম্পতি। আশেপাশের নিচু চরগুলো ডুবে যাওয়ায় হাজার হাজার ভরত পাখি এই চরে আশ্রয় নেয়। বর্ষার পানি জমে তৈরি হওয়া অস্থায়ী আংশিক নিমজ্জিত জলাভূমিতে টিটিরা দলবেঁধে বেড়ায়।

কুষ্টিয়া-পাবনা সংলগ্ন গড়াই-পদ্মা নদীর চরগুলোতে আজ অবধি প্রাপ্ত পাখির প্রজাতি সংখ্যা ১৬৫। তন্মধ্যে ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত হরিপুর চরেই প্রাপ্ত পাখির সংখ্যা ১২৯। এ চরে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে IUCN কর্তৃক লাল তালিকাভুক্ত পাখি আছে ৭ টি ঃ Indian Spotted Eagle, Short-eared Owl (সর্বশেষ ২০১৯), River Lapwing, Black-headed Ibis (সর্বশেষ ২০১৩), Red-headed Falcon, Gray Francolin (সর্বশেষ ২০১৮), Black Bittern. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পাখিদের মাঝে আছে Black-breasted Weaver (২০১৯), Streak-throated Swallow (২০১৯), Indian Thick-knee (২০১৮), Ashy Crowned Sparrow Lark (২০১৬) প্রভৃতি। ২০১৮ সালে রাজশাহীর পরপরই হরিপুর চরে Gray Francolin এর পুনঃআবিষ্কার সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। পূর্বে পাখিটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হিসেবে গণ্য করা হতো।

চিত্র ঃ বিলুপ্তির তালিকাভূক্ত Gray Francolin সহ হরিপুর চরের পাখিরা। (Photo: Sadanando Mondol)

স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যায় যে, এরকম জীবন্ত, বিস্তৃত আর বুনো একটি পরিবেশের হঠাৎ করে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তবুও কুষ্টিয়ার প্রকৃতিপ্রেমীগণ এই হৃদয়বিদারক সত্যকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। বিগত কয়েক বছরের মাঝেই হরিপুর চরের অধিকাংশ পাখির আবাস চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়ার পেছনে আছে বেশ কয়েকটি নিয়ামক। প্রথমত, গড়াই নদীর পানির উচ্চতা নেমে যাওয়ার কারণে চরটি তার বর্ষাকালে আংশিক জলামগ্নতার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, ফলে একসময়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা চরটি মানুষের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ২০১৭ সালে কুষ্টিয়া আর হরিপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য চালু করা হয়েছিলো শেখ রাসেল সেতু। তারপরপরই শুরু হয়েছিলো হরিপুর চরের পাশ দিয়ে একটি পাকা রাস্তা তৈরির কাজ। ফলে রাস্তার পাশের অরক্ষিত বনাঞ্চলগুলো কিংবা জমিগুলো, যেগুলো এতোদিন প্রকৃতির অংশ ছিলো, সেখানে স্থান করে নিলো মানুষের দখলদারিত্ব। চরের স্থানীয় মানুষেরা দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে শীতকালে ঘাসবনের অংশ বিশেষ চাষাবাদের জন্য পুড়িয়ে দেওয়া, অর্থনৈতিক বা গৃহস্থালি নানান কাজের জন্য লম্বা ঘাস কেটে নেওয়ার মতো বিষয়গুলো আগে থেকেই ছিলো; তবে জনসমাগম বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। চরে সহজগম্যতার সাথে শুরু হয় ব্যাপক পরিসরে গাছ কেটে ফেলা

আর বালি উত্তোলনের মতো কাজ। শীতকালে এখন অন্যান্য অনেক নদীর মতো আমাদের গড়াই নদীও হয়ে যায় মৃতপ্রায়; নদীরক্ষায় ড্রেজিং করার সময় বালি সরাসরি অপরিকল্পিতভাবে চরের ঘাসবনে ফেলা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয়, হরিপুর চরের যে প্রাণে পরিপূর্ণ জীবন্ত বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবে এখন বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে, আর একেই বুঝি বলা হয় "অস্তিত্বের সংকট"।

যদিও চরটির মূল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখন অতীত এবং হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তা সত্বেও প্রকৃতিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিলে হয়তো কিছু বুনো পাখিকে আমরা দেখতে পাবো আবারও, হয়তো শীতকালে অতিথি পাখিরা আবারও চরটিকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার শুরু করবে। মানুষের পাশাপাশি চরের অবশিষ্ট জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখার জন্য পরিকল্পনা মাফিক কিছুটা জায়গা নির্ধারণ করে সেখানে প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকর সবরকম কার্যক্রম যেমন ঃ জমি দখল, জনসমাগম, ড্রেজিংয়ের বালি ফেলা, বালি উত্তোলন প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। স্থানীয় মানুষের জন্য কিছু অংশ উন্মুক্ত রেখে বাকি সংরক্ষিত অংশে ঘাসকাটা, চাষাবাদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। পাখি শিকার বা ফাঁদ পেতে পাখি ধরার মতো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক। দৃষ্টি দেয়া দরকার প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্টদের।

একই সঙ্গে এর মাঝে কিছু চ্যালেঞ্জ আর প্রশ্ন রয়েই যায়; চরের উপর ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি সামাল দিয়ে প্রকৃতির জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া বাস্তবিকই দুষ্কর। উপরন্তু ইতোমধ্যেই মানুষের দখলে চলে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার, সীমিত এলাকার মাঝে স্থানীয় মানুষের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নিশ্চিত করে প্রকৃতির জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি বড় চ্যালেঞ্জই বটে। নদীর পানির উচ্চতা পরিবর্তন আর ভূ-প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণেও বাস্তবেই আগের মতো প্রাণবন্ত প্রকৃতি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, হয়তো বর্তমানে কোণঠাসা হয়ে আনাচে-কানাচে টিকে থাকা পাখিবৈচিত্র্যকে কিছুটা ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হবে এ উদ্যোগের ফলে।

তবে আশা হয়তো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। পার্শ্ববর্তী কিছু চরে বিগত বছরের শেষের দিকেই ৪,০০০ এর উপর Gray-headed Lapwing এর ঝাঁক, ৩০০০-৪০০০ Wood Sandpiper, ২-৩ শত Ruff, ৩০ এর উপর Golden Plover, ৫ টি Black-tailed Godwit এর উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়, কুষ্টিয়ার গড়াই-পদ্মা নদীর পাখি বৈচিত্র্য অস্তিত্ব সংকটে পড়লেও এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। কুষ্টিয়ার চরাঞ্চলে যেই স্থানীয় এবং বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাখিবৈচিত্র্য এখনও দেখা যায়, তা একমাত্র মানুষ ও চরাঞ্চলের পাখি-প্রকৃতির মাঝে সহাবস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। নতুবা অচিরেই এরা হারিয়ে যাবে, আর প্রকৃতির কাছে একদিন না একদিন চরম মূল্য দিতে হবে মানুষকেই।

হরিপুর চরের পাখি ও জীববৈচিত্র্যের অপুরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে ইতোমধ্যেই। যথাযথ দৃষ্টি না দেওয়ায় ও প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগ না থাকায় এখানকার জীববৈচিত্র্য অভিভাবকহীন নিরব বিলুপ্তীর প্রহর গুনছে। কিন্তু সময় ফুরিয়ে যায়নি, অপরিসীম মূল্যমানের এ পাখি ও জীববৈচিত্র্যের আবাস টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এখনই প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ, সমন্বিত ও সময়োপযোগী উদ্যোগের।

River Lapwing, Red-wattled Lapwing and Red-headed Falcon River Lapwing বৈশ্বিকভাবে Near threatened হিসেবে চিহ্নিত (বিশ্বে ৬৭০-১৭০০০টি পাখি অবশিষ্ট আছে বলে IUCN কর্তৃক বিবেচনা করা হয়)

WILDLIFE TUBERCULOSIS (TB): A HIDDEN TREAT FOR WILDLIFE CONSERVATION IN SOUTH ASIA INCLUDING BANGLADESH

Dr. Md. Nizam Uddin Chowdhury
DVM (CU), MS (BAU), MVM, One Health Fellow,(Massey University, New Zealand)
Veterinary Surgeon, Sheikh Kamal wildlife Center, Gazipur

Globally, Tuberculosis (TB) is one of the most widespread zoonotic diseases and one of the leading causes of human and animal death. It is estimated that a total of 1.5 million people died from TB across the world in 2018. In South Asia, TB covers 34% of the global TB burden with 03 million of infection and a mortality of 0.4 million people in 2013. Bangladesh is one of the high burden countries among the eight listed countries that accounted for two thirds of the total TB cases worldwide and ranked seventh in terms of global occurrence of TB. In wildlife TB has been widely documented in both captive and free ranging wildlife including non-human primates, elephants and other exotic ungulates, carnivores, marine mammals and psittacine birds in several countries across the world. However, ecologic, environmental or demographic factors including human–wildlife conflict contribute to emergence of zoonotic diseases in South Asia and creating a negative impact on biodiversity conservation.

Historically, it was believed that human TB evolved from animal TB as a zoonosis. The hypothesis for that belief was based on the characteristic of a wide host range for *M. bovis* in animal and narrow host range of *M. tuberculosis*. But *M. bovis* is the major cause of animal TB and distributed globally. Besides, Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTBC) is a group of genetically closely related pathogens that can cause tuberculosis (TB) in human and animal and It includes M. tuberculosis, *M. africanum* (de Jong et al., 2010) *M. bovis, M. caprae, M. pinnipedii, M. microti, M. orygis, M. suricattae, Dassie bacillus, M. mungi*, and *Chimpanzee bacillus*. Among pathogens of animal TB, *M. bovis*, is an emerging pathogen of free-ranging wildlife and posing continuous threat for survival of several captive wildlife species across the world.

South Asia is one of the world's hotspots for biodiversity and home to many endangered species like Asian elephants, Rhinoceros and Bengal tigers. In recent years, TB in wildlife is increasingly being detected in South Asian countries and in Asian elephants it has been recognized as an emerging infectious disease. For that reason, TB screening in Asian elephants (Elephas maximus) has been carried out in South Asian countries including Nepal, India, and Sri Lanka whereas these countries have a high TB prevalence in human population. The tradition of keeping and training elephants in South Asia is long standing and continues to support various religious and tourism-related activities, as well as forestry and conservation management. This practice provides sufficient chance for transmission of TB from humans to elephants or vice versa. There are about 200 captive elephants in Nepal that are used by government authorities for patrolling of protected areas and private sector for eco-tourism. In Nepal, TB was first reported in captive elephants at Chitwan National Park in 2002 and afterward 13% elephants were found

positive among 115 captive elephants in a TB screening test. But it is disappointing that from 2002 to 2014 more than 10 elephants died of TB in Nepal. Later on, TB infection has been reported in a free roaming wild Asian elephant in India and Sri Lanka simultaneously in 2017. But it a matter of concern that Indian wild elephants frequently migrate to Bangladesh through wildlife corridors and it increases likelihood of transmission of TB in resident elephants of Bangladesh. Besides, the greater one-horned rhinoceros is the largest species of rhinoceros that is listed in Appendix I (most endangered) of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), categorized as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List, and listed as a protected species by the Government of Nepal. Interestingly, in 2015 a new species of TB bacteria (*M. orygis*) has been detected from a free-ranging greater one-horned rhinoceros at Chitwan National Park and this national park holds most of the rhinoceros population (605 individuals) of Nepal. So, having devastating nature, TB is creating a great conservation challenge for this vulnerable and isolated rhinoceros in Nepal. Besides, in a zoological garden of Pakistan, antelope namely spotted deer, chinkara gazella and black buck were infected with TB in 2012. Similarly, TB has been detected languor and rhesus monkey population in Inada and Nepal that linked to humans associated transmission.

However, Bangladesh is a country of rich biodiversity and is a home of roughly 53 species of amphibian, 19 species of marine reptiles, 139 species of reptile and 628 species of birds. At present across the country around 10,000 wild animals of native and exotic species kept in captive management at safari parks, eco-parks, national parks and aviary of the Forest Department for conservation & ecotourism. From the official record, it is observed that a significant number of wild animals died in these safari parks and eco-parks from different types of infectious diseases during last 04 years (i.e. 2016-2019). Although in most of the cases actual causes of death remain unknown, but recently TB infection has been identified in a Spotted Deer, Gaur, Giraffe and Common Eland at Bangabandhu safari park and Bhawal national park, Gazipur in Bangladesh. It is commented by wildlife health experts that TB infection could be transmitted from free ranging wild animals (Rhesus monkey, jackal, fishing cats etc.) & neighbouring livestock population coexisting in parks area. Moreover, evidence of spill over of TB infection between Rehsus monkey and cattle has created a new avenue in interspecies pathogen transmission in Bangladesh. But impact of TB is still overlooked and TB scenario in wildlife (i.e. frequency, distribution and transmission dynamics of TB) is yet underexplored in Bangladesh.

Tuberculosis in wildlife is a diverse and complex issue that require close collaboration between professionals from wildlife health, livestock health and public health for management actions. A collaborative TB management program under One Health approach is urgently warranted to address feasible solutions for prevention of tuberculosis at wildlife–human interface in South Asia including Bangladesh. One Health is a holistic approach that seeks to engage experts in human, animal, environmental health and other relevant disciplines at national or regional level for the management and mitigation of risks of emerging infectious diseases like TB. Finally, the One Health approach required to be operationalized at national level for the development of suitable cost-effective prevention and control measures for TB at wildlife-human interface, expediting wildlife conservation in Bangladesh.

সুদরবনের জীববৈচিত্র্য

ড. আসম হেলাল সিদ্দীকি
বিভাগীয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, খুলনা-৯০০০

সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ সংরক্ষিত বন ভূমির আয়তন ৬০১৭ বর্গ কিমিঃ। আমরা জানি বাংলাদেশের মোট সংরক্ষিত বনভূমির পরিমান ৯.৪% শতাংশ। যা দেশের (মোট আয়তনের মাত্র ১.৬ শতাংশ আমরা জানি সুন্দরবনের বন ভূমির সকল জায়গায় সমান হারে সকল প্রজাতির গাছ জন্মে না এবং প্রায় ৩ শতাংশ অঞ্চলে লতা গুল্ম বা অপ্রধান উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া নদী বেষ্টিত সুন্দরবনের চরে এবং নদীর কীনারে অনেক ফাকা জায়গা আছে যেখানে নতুন করে গাছ জন্মানো বেশ কঠিন বিষয় । আর সুন্দরবনের একেক প্রজাতির গাছ একেক অঞ্চলে বিদ্যমান এবং ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের কিছু দুর পর্যন্ত মাতৃ বৃক্ষ হতে বীজ পানিতে ভেসে গিয়ে চারা গজায় ও প্রাকৃতিক ভাবেই বন সৃজন হয়ে থাকে। এ জন্য ভিন্ন প্রজাতির গাছ বা কাঙ্খিত প্রজাতির গাছ সকল অঞ্চলে জন্মাবার লক্ষ্যে ও খালি জায়গা, চর ও নদীর কিনারে বৃক্ষ সম্পদের সম্ভার গড়ে তোলার লক্ষে সুন্দরবনে কৃত্রিম বনায়নের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি জেলা যথাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট নিম্নাংশের বঙ্গোপসাগর এর তীর বেষ্টিত ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান। সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য খুবই সমৃদ্ধ। এখানকার উদ্ভিদ সম্প্রদায় বড় বৈচিত্র্যময়। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক এখানে ২৪৫টি গণের অন্তর্গত ৩৩৪ প্রজাতির ছোট-বড় বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও পরজীবি উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সুন্দরী পশুর, গেওয়া, গরান, কেওড়া, বাইন, ধন্দুল, আমুর, খলসি, গোলপাতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী উদ্ভিদ প্রজাতি।

অপর পক্ষে প্রাণিকুলের মধ্যে চিত্রল হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বুনো শুকর, ডলফিন, সজারু, বানর, ইঁদুর বাদুড়সহ ৪৯টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণি এখানে পাওয়া যায়। চিল, শকুন, ঘুঘু, বক, সারস, দোয়েল, মাছরাঙা, ঈগলসহ ৩১৪ প্রজাতির পাখি, ১৪ প্রজাতির কাছিম, ৯ প্রজাতির গোসাপ, অজগর, কালকেউটে সহ ৩০ প্রজাতির সাপ, কুমিরসহ ৫৪ প্রজাতির সরিসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণিসহ বিশাল প্রাণি সম্প্রদায় নিয়ে সুন্দরবনের ফণা কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের বিশাল জীববৈচিত্র্যের অংশ হতে বর্তমানে অনেক প্রাণির বিলুপ্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ২ প্রজাতির উভচর, ১৪ প্রজাতির সরিসৃপ, ২৫ প্রজাতির পাখি এবং ৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণি বিলুপ্ত প্রায় অনেকে অবলুপ্ত কিছু আবার বিরল এবং হুমকির

চিত্র-১। সুন্দরবন সংলগ্ন চরে বনায়ন।

চিত্র-২। গহীন জংগলে বিচরণ রত হরিণ।

সম্মুখীন। গন্ডার, জলাকুমির, বুনোমহিষ এগুলো এখন আর সুন্দরবনে দেখা যায় না। প্রাণি ছাড়াও অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ বিরল ও এন্ডাঞ্জারড প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। সুন্দরবনে সর্বত্র সকল উদ্ভিদের বিস্তার ও বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয় না।

এ সকল বিষয় মাথায় রেখে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের যথাযথ সংরক্ষণ ও বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত কম চারাযুক্ত ও অপ্রতুল উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের জীব কনজারভেশনের জন্য বিরল ও সমস্যা সংকুল প্রজাতির দ্বারা পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন প্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ। কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে যেখানে যে প্রজাতির গাছ নেই এবং ফাঁকা জায়গা যেখানে বীজ ভেসে এসে চারা গজিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে বন সৃজন সম্ভব নয় সেখানে মাতৃবৃক্ষ সৃজনের উদ্দেশ্যে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রক্রিয়া গবেষণা কার্যক্রম আশা ব্যঞ্জক সফলতা আনতে সমর্থ হয়েছে।

ইতিপূর্বে সুন্দরবনের মধ্যে যেখানে গাছের চারা ছিল না কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে সেখানে সবুজের সমারোহ ঘাটছে এবং ইতোমধ্যেই ঐ সকল অঞ্চলে কিরপা, খলসি প্রভৃতির বিস্তার ঘটতে শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সুন্দরী আগামরা, পশুরের হাটরট রোগ ও আগামরা, কেওড়ার আগামরা, বাহিনের ঢোরে প্রভৃতি সমস্যার কারণে সুন্দরবনের রোগাক্রান্ত গাছে যথেষ্ট পরিমাণে ফুল-ফল ও পাতা তৈরী হচ্ছে না। ফলে বেঁচে থাকা রোগাক্রান্ত গাছের ছায়ায় নতুন চারা যেমন গজাচ্ছে না তেমনি পর্যাপ্ত ফুল-ফল না উৎপাদিত হওয়ায় নির্ভরশীল প্রাণিকুল ও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়া যেমন পশুর গাছ বিগত ১৯৭৩ সাল হতে কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকায় বয়স্ক গাছ যেমন হার্টরট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে এবং মহামূল্যবান কাঠের সার অংশ পঁচে নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক এ আক্রান্ত গাছ নিঃশেষ করে ফেলছে। তবে মজার বিষয় হলো বয়স্ক এবং ব্যবহার উপযোগী গাছগুলি আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হচ্ছে। সুন্দরী গাছের আগামরা রোগের ক্ষেত্রে বয়স্ক গাছ বেশী মারা যাচ্ছে। এ মরণ ও মড়ক প্রক্রিয়া ধীর গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ একটা আক্রান্ত গাছ মরতে ৫০-৬০বছর সময় লেগে যাচ্ছে। কাজেই বয়স্ক গাছ কেটে দিলে সেখানে অতিদ্রুত পরবর্তী রিজেনারেশন গড়ে উঠবে। ফলে একটা গাছের নীচে অন্তত ৫-৭ টা সুন্দরী ও পশুর গাছ এক যোগে বড় হয়ে উঠবে। একটি উপযুক্ত বয়স্ক গাছ যা হার্টরট রোগাক্রান্ত বা সুন্দরী গাছ যা আগামরা রোগে ক্ষতিগ্রস্থ বা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাকে বাঁচিয়ে রেখে আর ১০টি গাছের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ করা আদৌ যৌক্তিক নয়। কারণ সুন্দরীও পশুর গাছের কর্তনযোগ্য বয়স ১০০ বছর প্রায়। আবার রোগাক্রান্ত হয়ে মরে পঁচে শেষ হতেও ৫০-৬০ বছর যদি সময় লাগে ঐ সময়ের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার আগেই নির্বাচন পদ্ধতিতে কেটে দেশের কাজে লাগানো যথেষ্ট যুক্তি সংগত। কারণ অর্থনৈতিক দিক হতে এতে লাভবান হওয়া সম্ভব এবং নতুন প্রজন্মের গাছের বৃদ্ধি ও ফুল ফল উৎপাদন দ্রুত ও পরিমাণে অধিক।

চিত্র-৩। তীব্র লবণাক্ত অঞ্চলের সুন্দরবন।

চিত্র-৪। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সুন্দরবনের ফাঁকা জায়গায় গবেষণামূলক বিরল প্রজাতির (ভাতকাঠি) বনায়ন।

কাজেই সুন্দরবনের খালি জায়গা পতিত ভূমি, লতা গুল্ম বেষ্টিত অপ্রধান বনজ ভূমি, চর, মোহনা, উঁচু ভূমি, বন ভূমির মাঝের বৃক্ষ শূণ্য জলাভূমি, নদী, তীর, উঁচু নীচু ধানসি বন, রোগাক্রান্ত বনজ ভূমি, বৃক্ষ কর্তনের ফলে শূণ্য ভূমি, সিডর, আইলা আক্রান্ত এলাকা বা বন্যা দূর্গত এলাকার খালি জায়গা পূরণের লক্ষ্যে সুন্দরবনে কৃত্রিম বৃক্ষ রোপণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কারণ আমরা জানি সুন্দরবনের নদীগুলি মূলত সবই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং জোয়ার ভাটার পানি সমুদ্র হতে বা উজান হতে উত্তর দক্ষিণে উঠা নামা করে স্রোতের টানে বেয়ে যাওয়া বীজ জোয়ারের সময় নদীর পার্শ্ববর্তী ২০০-৩০০ মিটার ছড়াতে পারে। যেহেতু জোয়ারের পানি সুন্দরবনের গভীরে প্রবেশ করে না। একারণে নদীর কীনারে ঘন গাছের চারা ও ঝোপ দেখা যায়। কিন্তু গভীর জংগলে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে উপযুক্ত প্রজাতির চারা দ্বারা কৃত্রিম ভাবে বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন করা যায়।

সুতরাং সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বন সমৃদ্ধকরণ, জীন কনজারভেশন, সকল অঞ্চলে সব প্রজাতির বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত ও পরীক্ষামূলক বনায়ন ও খালি জায়গা পূরণ করা বাস্তব সম্মত। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে । এটাই আমাদের কামনা।

এ ক্ষেত্রে বন্য প্রাণির জন্য বেশ সহায়ক । কারণ পশুর বৃক্ষের ফল ও পাতা হরিণের খুব প্রিয় খাদ্য। এ বৃক্ষ যেহেতু অধিক ফল ও পাতা উৎপাদন করে না এবং কার্বন আত্মীকরণও কম পরিমাণ করে থাকে। সেজন্য বয়স্ক এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার আগেই মহামূল্যবান পশুর, সুন্দরী, বাইন ও কেওড়ার গাছ টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্তন করা সময়োপযোগী এবং নিঃসন্দেহে লাভজনক ও পরিবেশ বান্ধব।

সুতরাং সুন্দবনের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে উদ্ভিদ ও প্রাণির মিথোক্রিয়া জোরদারকরণের জন্য সুন্দরবনের ফেলিং রুলস পরিবর্তন সহ পরিবেশ বান্ধব নীতি পদ্ধতি গ্রহণ ও পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। কারণ সুন্দরবনের উদ্ভিদ সুস্থ্য না থাকলে প্রাণিরাও সুস্থ্য থাকবে না। খাদ্যাভাবে এবং অপুষ্টিতে ভুগবে। ফলে সুন্দরবনের চিত্রল হরিণ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাবে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবর্তনশীল পরিবেশে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। এ ক্ষেত্রে দেশকে ভাল বেশে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে অবশ্যই বিরূপ পরিবেশের মোকাবিলা করতে হবে।

FACTORS AFFECTING ON THE BENEFICIARIES' EFFECTIVENESS OF SOCIAL FORESTRY

Dr. Md. Golam Mortoza
Former Director General, Naational Agriculture Training Academy (NATA)

Imran Ahmed
Conservator of Forests, Social Forest Circle, Dhaka

Abstract

Foresty is very important aspect of Bangladesh Economy as it contributors 1.58% to the GDP of Bangladesh (Bangladesh Economic review, 2019:15) Beneficiary of social forest is the vital component of foresty as the beneficiary and beneficiary group directly involved in forest seedling production in nursery, plantation, manages and rearing of forest seedlings and plants in forest garden (Totha Konica, 2019:07) However, there are a lot of problems and critical aspects of forest beneficiaries and beneficiaries group. This study considered all the critical aspect of forest beneficiary and beneficiary's group. The findings of the study revealed that out of Sixteen characteristics of forest beneficiaries, forestl knowledge of beneficiaries, management orientation, beneficiarie's attitude towards improved technology, ability of beneficiaries to carryout proper plantation, rearing in carry out foresty activities and utilization of compositeness sources of information had significant at 0.01% level of probability.

Key Word : Effectiveness of beneficiaries, Management orientation and modern forest technology

Introduction

Agriculture is the backbone of the economy of Bangladesh and forest is one of the vital component (out of three) of Agriculture as per Bangladesh Economic Review/2019 (page-15). Total forest area in Bangladesh is 23.2 lakh hactre. Out of 23 lakh hactre 16.1 lakh hactre forest controlled by forest department. Rest 7.2 Lakh hactres is controlled by district administration. Out of 16.1 lakh hactre which in controlled by forest dept, 14 lakh hactre is naturally produced and rest 2.1 lakh hactre is artificially produced by forest dept in costal belt. Moreover 7.7 lakh hactre forest in home stead area in 2020. COVID-19 hit all the sector of Bangladesh Economy except Agriculture and forest Moreover, people of Dhaka and urban area migrate to rural areas and join in social foresty for their survive from COVID-19 Virus.

There are a tremendous success stories of social foresty programe in respect of poverty elivation and revenue income of Bangladesh which are started from 1981-1982

1. from 1981-82 to 2017-18, 94939 hactre land and 71,456 kilometers garden covered with aforestation. In this aforestation 6,52,601 beneficiary are involved whose (foresty) sale vale is 1071 core 34 lakh 44 thousand 245 taka .
2. 356 core 82 lakh 34 Thousands taka distributed to 1,68,564 beneficiaries (upto march/2019) which help to decreases the poverty level of beneficiaries of social foresty scheme 1.

3. Bangladesh government earns 389 core 16 kakh 25 thousands 958 taka from forest product of social foresty scheme.

So, from the above discussion, Social foresty programme is very important for poverty elevation in Bangladesh economy and eradicate climatic disaster.

However no systematic research study has so far been recorded to ascertain the up gradation of beneficiaries of social foresty. The present study was therefore under taken with a view to determines are the factors which help to develop the beneficiaries of social foresty which ultimately help to develop the social foresty scheme.

Methodology

The study was conducted in Jessore district and Mymensing district. A complete list of the beneficiary of forest dept was collected from local office of forest dept. There were a total of 300 beneficiary which are randomly selected from 137 village. The collected data were again up-dated in the years 2019.

Different model of beneficiaries' effectiveness are used for selecting independent and dependent factors

3.3.2 Different models of beneficiariess' effectiveness

For the study purpose and to select the factors which affect beneficiariess' effectiveness the following beneficiariess' effectiveness model have been studied:

i. Cummings and Schwab's model (1973)
ii. Cohen et al. model (1980)
iii. Schermeerhorn et al. model (1988)

1.

(a) Bangladesh economic review/2019 P. 219.
(b) Totha Konica, 2019 p1.

(i) Cumming and Schwab's model (1973): Cumming and Schwab's model contain two types of factors:

a) Environmental factors:
Job design
Supervision
Fellow worker/farmer/beneficiaries of foresty scheme
Compensation working condition
Training
Evaluation

b) Individual factor:
Ability- of members (beneficiaries) individual attributes
(i) Capacities (ii) Capabilities

ii) Cohen et al. (1980: 172) Model: They put forward the following model regarding effectiveness of beneficiaries or beneficiaries (Figure 1)

iii) Schermerhorn et al (1988) model: The model contains mainly three variables:

Individual attributes (Capacity to perform)

Willingness to perform (Work effort)

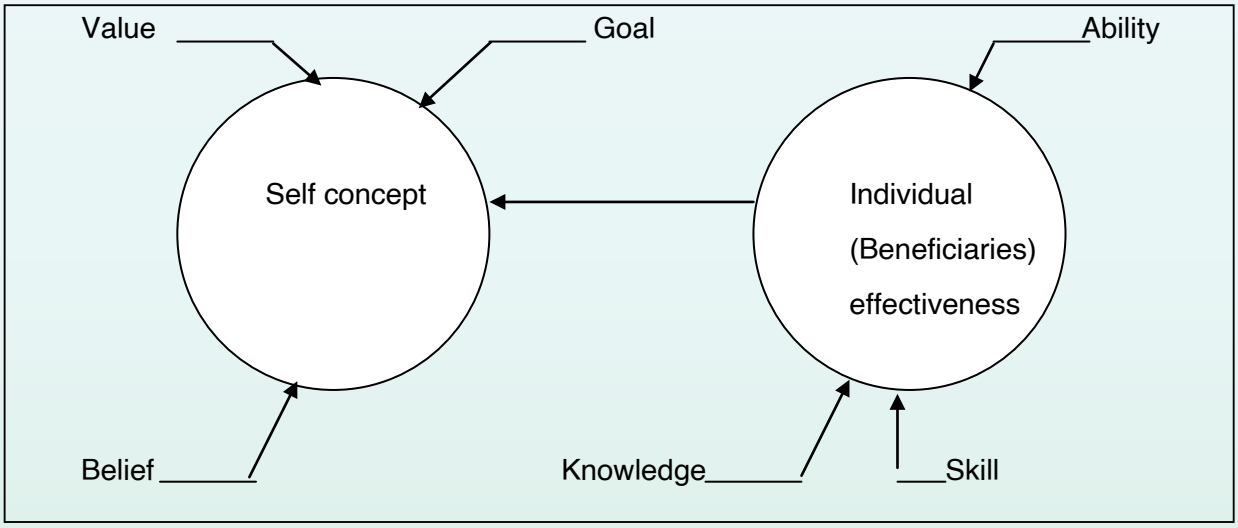

Figure :1 Cohen et al. (1980) model of effectiveness of beneficiaries (Adapted)

Organizational support

(Opportunity to perform)

Individual attributes: Individual attributes means the different characteristics of beneficiaries which are as follow.

- Demographic characteristics (age for example)
- Competency characteristics (attitude/ability)
- Psychological characteristics (e.g. values, attitudes and personality)

Thus individual attributes have the potential to influence performance by its impact on a persons capability to assigned tasks.

Willingness to perform: Work effort of beneficiaries means willing to perform. It is closely related with motivation to work, which means the forces within a individual that account for the level, direction, and persistence expanded at work. Motivation can be increased by incentive (Hersey and Blanchard,1993).

Organizational support: Group helps the individual member to perform

his/her task or job. The organization or group help the individuals in respect of providing:

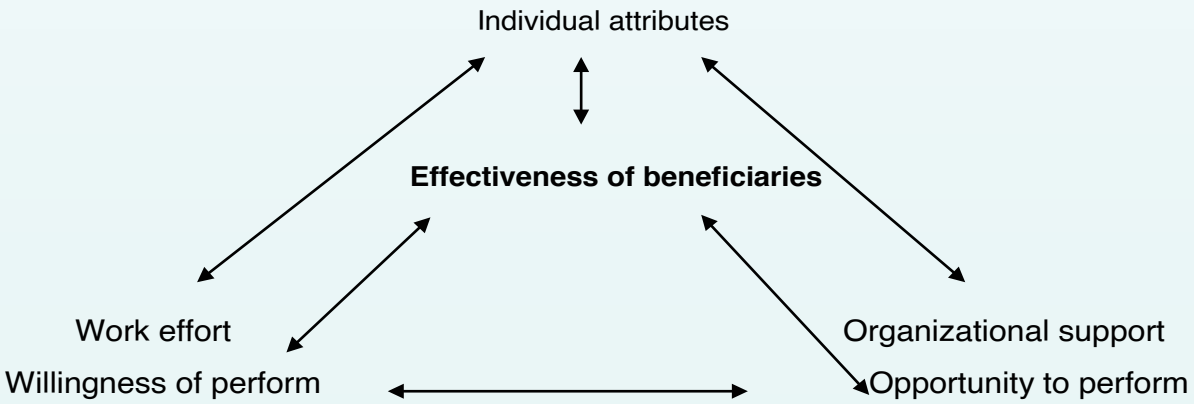

Figure 2: schermerhorn et al. (1988) model of beneficiaries effectiveness (Adapted)

- Job relevant knowledge
- Satisfaction of beneficiaries increased
- By increasing the level of effort they exert (Feldman and Arnold, 1983).

The variable are interlinked with one another (Figure 2)

Table 1. Variable Selected For Study And Their Measurement.

(i) Independent Variable	Measurement
(A) Socio Personal	Thyagarajan (1996)
1. Age	Thyagarajan (1996)
2. Occupation	Ray et al. (1995)
3. Family Education	Ray et al (1995)
4. Family size	Saha (1988)
5. Agricultural Knowledge	Structured schedule
6. Ability of beneficiaries to carry out group activities	Kashem (1992)
(B) Economic	Structured schedule
7. Farm size	Anwar (1994)
8. Total annual family imcom e	
9. Socio -economic status	Structured schedule
(C) Inter Systematic (Samanta, 1976)	Structured schedule
10. Cosmopoliteness	Structu red schedule
11. Participation in training progtramme	Structured schedule
12. Organizational participation	
13. Utilization of cosmopolite sources of information	Samanta (1977)
(D) Attitudinal	Moulik (1965)
14. Management orientation	Anwar (1994) (Slightly modified)
15. Innovation pron eness	
16. Attitude towards Forest technoiogy	

ii. Dependent Variables (a) Four dimensions of Effectiveness beneficiaries social foresty scheme 1. Adoption of HYV Seedlings of Forest plant 2. Adoptio n of irrigation and modern technology of foresty 3. Satisfaction of beneficiaries 4. Productivity of beneficiaries	Ray (1996) Ray (1996) Likert (1956) Sagar (1983)

Results and Discussion

1. Relationship and influence of beneficiaries' characteristics upon the effectiveness of beneficiaries of social foresty scheme.

1.1 Relationships of the sixteen characteristics of beneficiaries with beneficiaries effectiveness:

The highest significant relationships (0.422 to 0.745) was found with management orientation of forest beneficiaries

A very low correlation was found with the ten variables such as age, occupation, family education, familysize, farmsize. annualfamilyincome, socio economic status, cospoliteness, organizational participation and innovation proneness. A low correlation was found with participation in training programme, utilization of cosmopolite source of information and attitude towards foresty knowledge. A moderate to high correlation value was found with foresty knowledge, ability of beneficiaries to carry out group activities and management orientation.

The correlation coefficient between occupation, innovation proneness and beneficiaries effectiveness was -0.111 and -0.028 respectively which was though not significant, marked with negative trend. This indicates that occupation and innovation proneness had a depressinq effect on the beneficiaries effectiveness. This also indicates that as beneficiaries were involved in more than one occupation other than their foresty activities and as such new innovation had created confusion in their mind, so these two variables had depressing effect on the beneficiaries' effectiveness

Table- 1 indicates the relationships of 16 characteristics of beneficiaries with beneficiaries effectiveness. All the characteristics had positive relationships except occupation (X_2) and innovation proneness (X_{13}). The significant at 0.01 percent level of probality relationship was found with five variables, such as, foresty knowledge (X_5) management orientation (X_{12}), attitude towards foresty technology (X_{14}), ability of beneficiaries to carry out group activities (X_{15}) and utilization of cosmopolite source of information (X_{16}).

Table- 1. Relationship of 16 Characterstics of beneficiaries with four criteria/dimension of beneficiaries' effectiveness.

Selected characteristics of Beneficiaries	Dependent Variables					Null Hypothesis accept/ rejected
	Adoption of HYV Forest Seedling	Adoption of irrigation and modern technology of forest	satisfaction of beneficiaries	productivity of beneficiaries	number of significant	
1. Age (X_1)	0.008	0.121*	0.208**	0.240**	3	Rejected
2. Occupation (X_2)	0.044	-0.111	-0.401 **	-0.060	1	Accepted
3. Family education (X_3)	0.200**	0.287**	0.143*	-0.027	3	Rejected
4. Family size (X_4)	0.117	0.109	0.084	0.151 **	1	Accepted
5. Foresty Knowledge (X_5)	0.404**	0.350**	0.570**	0.465**	4	Rejected
6. Farm size (X_6)	0.Q31	-0.221 **	0.059	-0.213**	2	Accepted
7. Annual family income (X_7)	0.175**	0.234**	0.259**	0.215**	4	Rejected
8. Socio economic status (X_8)	0.283**	0.301 **	0.352**	0.202**	4	Rejected
9. Cosmopoliteness (X_9)	0.301 **	0.256**	0.391 **	0.401 **	4	Rejected
10. participation in training programme (X_{10})	0.210**	0.214**	0.242**	-0.037	3	Rejected
11. Organizational participation (X_{11})	0.204**	0.231**	0.427**	0.161**	4	Rejected
12. Management orientation (X_{12})	0.710**	0.666**	0.745**	0.492**	4	Rejected
13. Innovation proneness (X_{13})	0.095	-0.028	0.217*	0.091	1	Accepted
14. Attitude towards organization technology (X_{14})	0.523**	0.434**	0.468**	0.444**	4	Rejected
15. Ability of beneficiaries (X_{15})	0.459**	0.600**	0.604**	0.486**	4	Rejected
16. Utilization of cosmopolite source of info rmation (X_{16})	0.349*	0.305**	0.440**	0.249**	4	Rejected

Tabulated values with N-2 df: 0.05 level= 0.115;0.01 level = 0.151 where n = 300

* Significant at 0.05 percent level of probability ** Significant at 0.01 percent level of probability

1.2. Relationship of the 16 characteristics of beneficiaries with the combined effect of four dimension of member effectiveness.

The effect of individual dimension of beneficiaries effectiveness was sumtotal of four factors or characteristics of beneficiaries which influences on the four dimension of beneficiaries effectiveness discussed. In this section, the relationship and influence of sixteen characteristics of beneficiaries upon combined effect of foru dimension of member effectiveness has been described below.

In order to explore the relationships of sixteen characteristics of beneficiaries with sun total of four dimension of member effectiveness, first, the scores of four criteria of member effectiveness was standardized (Z scores) and the standardized score of four dimension added together and then divided by 4 to get the mean value of standardized scores which was correlated with the sixteen characteristics of beneficiaries to get the correlation coefficients. The findings are presented in Table. 5.2

Table-2 revealed that out of the sixteen characteristics of beneficiaries of social foresty scheme, nine characteristics had significant relationship with all the four dimension of beneficiaries effectiveness these variable are agricultural knowledge, annual family income, socio economic status, cosmopolite ness, organizational participation management orientation attitude towards foresty technological knowledge, ability of beneficiaries to carry outforesty activities and Utilization of cosmopolite of information. As there is high multicollinearity among the sixteen characteristics of beneficiaries, stepwise regression was carried out which has been shown in section 1.3 to extract the influence of characteristics of beneficiaries, which had significant upon combined effects of four criteria of beneficiaries effectiveness.

Table 2. Relationship of 16 characteristics of beneficiariess with the combined effect of four criteria of members effectiveness.

Selected characteristics of the beneficiaries	coefficients of correlation 's' 'r'	Significant at
1. Age (X_1)	0.023	NS
2. Occupation (X_2)	-0.066	NS
3. Family education (X_3)	0.228	NS
4. Family size (X_4)	0.083	NS
5. Foresty knowledge (X_5)	0.548	P<0.01
6. Farm size (X_6)	0.097	NS
7. Annual family income (X_7)	0.331	P<0.05
8. Socio economic s tatus (X_8)	0.413	P<0.01
9. Cosmopolitenes (X_9)	0.403	P<0.01
10. Participation in training programme (X_{10})	0.187	NS
11. Organizational participation (X_{11})	0.304	P<0.05
12. Management orientation (X_{12})	0.792	P<0.10
13. Innovation proneness (X_{13})	-0.215	NS
14. Attitude towards foresty technology (X_{14})	0.590	P<0.10
15. Ability of beneficiaries to carry out foresty activities (X_{15})	0.627	P<0.10
16. Utilization of cosmopolite sources of information (X_{16})	0.429	P<0.10

Tabulated values with N -2 df: 0.05 level= 0.115;01 level = 0.151 where n = 300

* Significant at 0.05 percent level of probability

** Significant at 0.01 percent level of probability.

1.3 Contribution of the 16 characteristics of the beneficiaries upon the combined effect of four

The nine characteristics of beneficiaries were significant towards combined effect of four dimensions of effectiveness of beneficiaries. However, it was very difficulyt to understand and find out the highest contributing factor as it was difficult to separated the factors from multi-collinearity effect among the independent variables. So, stepwise multiple regression analysis was carried our to observe the effect of independent variable upon dependent variable (combined effectiveness of four criteria of beneficiaries)

In the stepwise multiple regression analysis only two variable were included at a time to the model. It followed the fwo steps and no further steps were not needed as rest of the variables were not included as they were not highly significant towards the model which was described below in Table-3.

Table-3 : Summary of result of stepwise multiple regression analysis of dependent variable beneficiaries (combined four dimension of beneficiaries' effectiveness) on 16 indepndent characteristics.

Step	Independent variables entered in steps	Un-standardized partial 'b' coefficients	Adjusted R_2	Changed in R_2	Standardized error of the estimate	T-value	F-value
1	2	3	4	5	6	7	8
1	constant	-11.859**	-	-	-	-8.776**	80.734**
	X_{12}	0.497**	0.627	0.627	2.0505	8.985**	
2	Constant	-12.684**	-	-	-	10.094**	54.027**
	X_{12}	0.400**	0.627	0.627	2.0505	6.863**	
	X_9, X_{12}	0.208**	0.697	0.070	1.8664	3.288**	

Variation explained in % 62.70
7.0%

** Significant at 0.001 level of probability

The coefficient of multiple determination indicated in the Table 3 demonestrate that the three variables included in the regression equation could predict 69.70 percent (62.70+7.0%) of the dependent variable of beneficiaries effectiveness (col. 5, R^2). The first variables to enter the stepwise multiple regression equation was management sprientation (X_{12}). This variable had the highest contribution of 62.70 percent (col 4, R^2) in predicting the dependent variable. However rest 30.30 percent variation of the dependent variable could not be explained by the model. Therefore on the basis of the date reflected in Table 3 the final least square regression equation fitted by X_{12} and X_9 variable would be: $y=12.684 + 0.627x_{12}+0.070x_9$

Where,

X^{12} management orientation

X_9 = Cosmopoliteness

Effectiveness of beneficiaries was measured by four viz. adoption of HYV seedling of foresty plant, adoption of irrigation and modern technology of forest technology, satisfaction of beneficiaries and productivity of beneficiaries. All those indicators are mainly influenced by five factore, such as cosmpotiteness, organization al participation, management orientation, ability of beneficiaries and utilization of cosmopolite sources of information. However it had found that combined effect of four dimension members effectiveness was influenced only by management orientation and cosmo-politeness. So, management orientation and cosmo polite sources of information were the most important characteristics for beneficiaries effectiveness.

Conclusion

Involvement of beneficiary in some social foresty scheme was relatively better and some were poor in the study area. It is found that poor INVOLVEMENT is due to poor knowledge, poor management orientation, poor attitude to towards improved foresty technology, poor ability of beneficiaries and poor utilization of cosmopolite source of information of beneficiaries to carry out foresty activities. So it may be thought that there was a scope to make good arrangement of alove factors for greater involvement of beneficiaries of social foresty because foresty knowledge, management orientation, good attitude towards imporoved technology, high ability of beneficiaries and high use of cosmopolite source of information of the beneficiaries have contributed in acceleration the development of social foresty.

Recommendation

The findings and discussion as presented above lead to the following recommendation:

1. From results and discussion, further research may be carried out about the significant factors of this research findings that may be applied properly in social foresty area for further recommendation.
2. In social foresty, participation of beneficiary is very important so, further research may be carried by the dept of foresty out regarding the participation and poverty level of beneficiaries in social foresty scheme.
3. Farther research may be carried out about the role of Social foresty in respect of employment generation which is hit by COVID-19 Virus.
4. Further Research may be carried out of findout the role of Agro foresty in development of rural economy (beneficiaries income) and nutrition level of beneficiaries (by producing fruit gardening of social foresty)

Reference:

1. Anowar. A.B.M.N. (1994). "A Study for Involving Rural Youth in Extension Activities in Three Selected V Villages of Mymensingh District." An unpublished Ph.D. Thesis of Dept. of Agricultural Extension Education. BAU, Mymensingh.
2. Bales R.F. (1970). *Personality and Interpersonal Behaviour.* New York: Holt, Rinehart and Winston.
3. Cohen, L. and M. Holiday (1982) *Statistics for Social Scientists.* Harper and Row publishers.
4. Anonymous *Totha Konica* Forest dept, Govt. of Bangladesh.
5. Kashem, M.A. (1992). *Block Supervisors' Credibility as Communicators' of Technical Advice Under the T & V system.* Research Monograph No.4. Mymensingh. Dept. of Agricultural Extension Education. BAU, Mymensingh .
6. Likert, R. (1956) *Motivation and increased productivity management Record,* 18(4) 128-131

7. Miller. D.C. (1991) *Hand Book of Research Desing and Social Measurament* (3rd Ed) Now Delhi, Sage Publication.

8. Mortoza, M.G. D (2002) “Factors affecting the effectiveness of beneficiaries in Krishak Samboy Somity involved in Foresty project”. An unpublished Ph.D. Thesis, Oept. of Agricultural Extension Education, BAU. Mymensingh.

9. Moulik. T.K (1965) “A Study of the Predictive Value of Some Factors of Adoption of Nitrogenous Fertilizers and the influence of Sources of Information on Adoption Behaviours”. Unpublished Ph. D. thesis. Division of Agricultural Extension IARI. New Delhi.

10. Anonymous (2019) “ Bangladesh Economic Review” Ministry of Finance, Bangladesh.

11. Rajeev. V.P. (1995). "A Study on the New Extension System in Kerala Based on Group Action Approach." An Unpublished Ph.D. Thesis. Agricultural Extension Division. IARI. New Delhi. India .

12. Ray. G.L.P. Chattergee and S.N Banargee. 1996. *Technological Gap and Constraints in Agricultural Technology Transfer*. Calcutta: Naya Prokash .

13 Saha PK (1988). "Performance of Contact Farmers Under the Training and Visit System in Bera Upazila of Pabna District". An unpublished M.Sc. Thesis, Oept. of Agricultural Extension Education, BAU. Mymensingh.

14. Samanta R.K. (1977). "A study of Some Agro economic. Sociopsychological and Communication Variables Associated with Repayment behavior of Agricultural credit users of Nationalized Bank." An unpublished Ph.D. Thesis Department of Agricultural Extension. Bidhanchandra Krishi Viswavidyalaya. West Bengal, India.

15. Thyagarajan S. (1996). "Yield Gap and Constraints to High Yield in Rice at Farm level" An unpublished Ph.D. Thesis, Department of Agricultural Extension, Annamalai University. Annamalainagar-608-002.

16. Waliullah. A.N.M. (1977). "Relationships of Selected Environmental Factors With the Efficiency of Power Pump Schemes" An unpublished M.Sc. Thesis. Department of Agricultural Extension, BAU, Mymensingh.

কোভিড-১৯

নির্মল কুমার পাল
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা

ঈশ্বরতো নন মানুষের একার
তিনি উদ্ভিদরাজির, প্রাণীকূলের
জড়জগতের, বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকলের।
সকলকেই তাঁর দেখতে হয়
তবে মানুষকে তিনি বেশি ভালবাসেন
যেমনটি আমরা ভালবাসি শিশুদের।

কিন্তু যখন লোভী মানুষের অপতৎপরতায়
ওজোনস্তর ক্ষয়ে যায়, জলরাশি দূষিত হয়
সবুজ হারিয়ে যায়, পৃথিবী হয় দূর্দশাগ্রস্থ;
যখন আমাজন, পেঙ্গুলিন আর গঙ্গা
একত্রে করে আর্তনাদ, আকুল প্রার্থনা
সৃষ্টিকর্তার তাদের প্রতি হয় অপার করুণা
ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানুষকে করতে নিবৃত্ত
তৈরি করেন ভয়ঙ্কর মারোণাস্ত্র
তীব্র সংক্রামক ভাইরাসঃ করোনা।

বৃদ্ধ ও দূর্বল মানুষকে অপসারণ করে
পৃথিবীকে করেন ভারমুক্ত
সুস্থ-সবল মানুষকে গৃহবন্দী করে ফেরান
প্রকৃতির ভারসাম্য, বাস্তুসংস্থান, জীববৈচিত্র্য।
সাগরলতা আর লাল কাঁকড়া
ফিরে পায় তাদের হারানো বাসস্থান
ডলফিন পায় খেলার মাঠ
বাতাস স্বাস্থ্য আর বসুধা যৌবন
যাতে উজ্জীবিত হয় সকলের মন।

বন্ধ করে বন্যপ্রাণীর হাটবাজার
পালিয়ে যায় আন্তর্জাতিক চোরাকারবার
পরিবর্তিত হয় কুসংস্কারাচ্ছান্ন খাদ্যাভাস
বিবর্তিত হয় পশু হত্যার ধর্মীয় বিশ্বাস
জীবজগতে ফিরে আসে প্রাণের উচ্ছ্বাস
শুধু লকডাউনে সৃষ্টিসেরার নাভিশ্বাস।

ঈশ্বর মানুষকে বড় বেশি ভালবাসেন
তাই নব সৃষ্টিতে উদ্বেলিত না হয়ে
মানব মৃত্যুতে হন ব্যথিত,
দিয়ে কোভিড-১৯ টিকা বিশ্ববাসীকে করেন রক্ষা
মানবজাতি পায় প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানের শিক্ষা।

বৃক্ষ রোপণঃ মহানুভব খলিফা এবং প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধের হৃদয়স্পর্শী গল্প

সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুল আনোয়ার
" আল্ওয়ান মধু জাদুঘর ও গবেষণা কেন্দ্র " চট্টগ্রাম।

এক মুসলিম খলিফা, প্রতিদিন উজির-নাজির নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়ে প্রজাদের কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখতেন। কোনো প্রজার কর্মকান্ড কিংবা কারো কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি প্রকাশ সূচক "ঠিক বলেছো" শব্দ যুগল যদি খলিফার মুখ হতে উচ্চারিত হতো তবে উজির তাৎক্ষণিক ভাবে কোষাগার থেকে, এক মুষ্টি স্বর্নমূদ্রা, সেই প্রজাকে দান করে দিতো। এ বৈকালিক ভ্রমণ রাজা ও প্রজা সকলের জন্যই খুবই উপভোগ্য ছিল।

একদিন রাজা দেখলেন, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যক্তি রাস্তার পাশে খেজুরের গাছ রোপন করছে। রাজা তাজ্জব হয়ে বললেন, 'ওহে বুড়া, তুমি যে খেজুর গাছ লাগাচ্ছো, তার ফল ভোগ করতে তোমার, কতদিন সময় লাগবে?" বৃদ্ধ ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "ধরে নিন বারো বছর"। রাজা উপহাসের সুরে বললেন, "ওহে নির্বোধ বুড়া! এতদিন পরে এর ফল তুমি কি ভোগ করতে পারবে"? বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে বললেন, "আপনার মত, আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি চিন্তা করতেন, তাহলে আজ আমরা কোনো গাছ হতেই ফল ভোগ করতে পারতাম না।" এখন আমি বীজ রোপন করছি আর ফল ভোগ করবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। রাজা বৃদ্ধের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'বুড়া মিয়াতো, 'ঠিক বলেছে"। সাথে সাথে উজির এক মুষ্টি স্বর্নমূদ্রা বৃদ্ধ মানুষটার হাতে দিয়ে দিল। স্বর্নমূদ্রাগুলো থলিতে রাখতে রাখতে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "মানুষ বীজ রোপন করে ফল পায় অনেক বছর পর, আর আমি বীজ রোপন করার সাথে সাথেই ফল পেয়ে গেলাম।"

এবার রাজা কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে বলে ফেললেন, "তাজ্জব ব্যাপার, বুড়া মিয়াতো, 'ঠিক বলেছে' এখনি বীজ রোপন করলো আর এখনই এক মুষ্টি স্বর্নমূদ্রার মালিক হয়ে গেলো!" রাজা দ্বিতীয় বার 'ঠিক বলেছো' বলার কারণে উজির আরও এক মুষ্টি

স্বর্নমূদ্রা বৃদ্ধ মানুষটার হাতে দিল।

রাজা এবার সামনের দিকে অগ্রসর হবেন এমন সময় বৃদ্ধ আবারো বলে উঠলেন, "জনাব খেজুর গাছে রস মিলে বছরে একবার, আর আমি খেজুরের চারা রোপন করেই স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে গেলাম দুবার। এক গাছ হতে বছরে দুই বার ফল পেলাম।"

খলিফা বৃদ্ধের কথায় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন, এবং সম্মোহিত হয়ে বলে ফেললেন, "বুড়া মিয়াতো, 'ঠিক বলেছে'। নিয়ম অনুযায়ী উজিরকে আরো এক মুষ্টি স্বর্নমূদ্রা বৃদ্ধের হাতে দিতে হলো। একই ব্যক্তিকে তিন তিন বার স্বর্ণমূদ্রা দিয়ে উজির অসহিষ্ণু হয়ে খলিফাকে বললেন, "মহানুভব, দ্রুত বুড়ার সংশ্রব ত্যাগ করুন নচেৎ আজকের সব স্বর্ণমূদ্রা এই কুশলী বুড়াকেই দিয়ে যেতে হবে!"

একটা খেজুর গাছ রোপন করে, তাৎক্ষণিক ফল হয়তো আপনি পাবেন না। কিন্তু একটু চিন্তা করুন, আজ হতে অনেকটা বছর পর আপনি যে মাটিতে ঘুমিয়ে থাকবেন, সে মাটির উপরেই লাগানো খেজুর গাছে পাখি বাসা তৈরি করছে, পথিকের ছায়া মিলছে, ভোজনরসিকদের রস ও গুড় মিলছে। আর একটু নিচেই মাটির ঘরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, আপনার আমলনামায় ফল যে াগ হে চ্ছ ।

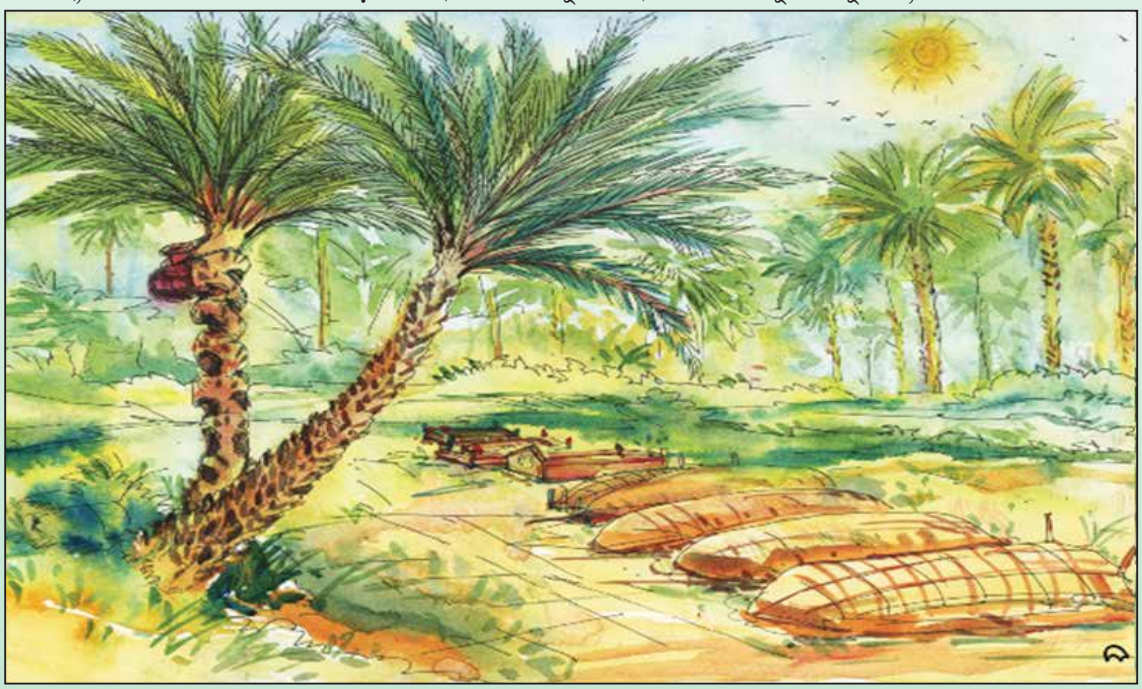

উপকূলীয় বন গবেষণায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা

মো. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া
রিসার্চ অফিসার, প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরিশাল

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত। এ বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রের জলরাশি দ্বারা প্রতিদিন প্লাবিত হয়। উপকূলীয় এ তটরেখা ৭১০ কি.মি. দীর্ঘ। উপকূলীয় এলাকা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৩০ ভাগ । মোট জনসংখ্যার ২৮% মানুষ এ জলবিধৌতি এলাকায় বসবাস করে। উপকূলীয় এলাকায় ক্রমাগত পলি পড়ার কারণে প্রতি বছরেই নতুন নতুন চর সৃষ্টি হচ্ছে। অবস্থানগত কারণে দেশের উপকূলীয় এলাকা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ । সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাসে প্রতি বছরই কম-বেশি এ এলাকা দূর্যোগ কবলিত হয়। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যদিও এ এলাকায় মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে প্রতিবছর এ জনপদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলে বর্ষাকালে জোয়ারের স্থায়িত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাটা শেষ হতে না হতেই আবার জোয়ারের পানি ঢুকে যাচ্ছে লোকালয়ে। নদীগুলোর নাব্যতা মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন। এ অবস্থা চলতে থাকলে উপকূলের নীচু ভূমিগুলোতে বর্ষাকালে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীতে ম্যানগ্রোভ বন সাধারণতঃ সমুদ্রের জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত প্রাকৃতিক বন হিসাবেই দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে ম্যানগ্রোভ বন সৃজন খুবই সাম্প্রতিক যা অল্প কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ ম্যানগ্রোভ বন সৃজনে সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশ বন বিভাগ উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে ১৯৬৬ সন হতে উপকূলীয় চর বনায়নের কাজ শুরু করে। বন বিভাগ এ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ২,০৯,১৪০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করেছে।

উপকূলে বনায়ন ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং ইউএনডিপির ২০১৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উপকূলীয় বনভূমির (বৃক্ষাচ্ছাদিত) পরিমাণ বর্তমানে ৬১,৫৭৪ হেক্টর। এ বনের অধিকাংশই হলো কেওড়া প্রজাতির একক বন। উপকূলীয় এ বন বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। বহু পূর্ব হতেই এ কেওড়া বন কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়া ক্রমাগত পলি পড়া ও গবাদি পশুচারণের ফলে উপকূলীয় বনভূমি ক্রমান্বয়ে উঁচু ও শক্ত হয়ে গেছে। এ কারণে কেওড়া গাছের বর্ধন হার কমে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে গাছে মড়ক দেখা দিচ্ছে। অন্যান্য প্রধান প্রধান ম্যানগ্রোভ প্রজাতির কম অনুপস্থিতির কারণে প্রাকৃতিকভাবে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির রিজেনারেশন খুবই কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে উপকূলীয় বনের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ বনায়নের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কেওড়া প্রজাতির আবর্তনকাল এবং এর জীবনকালও সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া কেওড়া ও বাইন প্রজাতির মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় বনের মধ্যে অনেক ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেক ভূমিতে বনায়ন অসফল হওয়ায় ফাঁকা অবস্থায় পতিত পড়ে আছে। অন্যদিকে উপকূলীয় কেওড়া বনের অভ্যান্তরে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো নতুন চারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় অপেক্ষাকৃত স্থায়ী কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গেওয়া প্রজাতির প্রাকৃতিক রিজেনারেশন বেশি দেখা যাচ্ছে। আবার যে সমস্ত চরে অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বীজের উৎস আছে সেখানে ঐ সব ম্যানগ্রোভ প্রজাতির রিজেনারেশন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সমস্ত প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গজানো চারা রক্ষণাবেক্ষণ করলে স্থায়ী বন সৃষ্টি সম্ভব।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেতের বংশ বিস্তার ও চাষ পদ্ধতি

উপকূলীয় এলাকায় বাঁশ ও বেতের উৎপাদন বাড়াতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বসতভিটায় বাঁশ ও বেত চাষ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাঁশের ২ টি প্রজাতির যথা- বাইজ্জা বাঁশ (*Bambusa vulgaris*) এবং বরাক বাঁশ (*B. balcooa*) এবং বেতের দুইটি প্রজাতি যথা- জালি বেত (*Calamus tenuis*) এবং কেরাক বেত (*C. viminalis*) এর চাষ বিষয়ক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় বাংলা বাঁশের বর্ধনহার ও বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক পাওয়া যায়। অন্যদিকে উপকূলীয় পূর্বাঞ্চলে বেতের ২ টি প্রজাতিই উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে সমগ্র উপকূলীয় এলাকার বসতভিটায় বনায়নের জন্য জালি বেত উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়।

উপকূলীয় এলাকায় বসতবাড়ীতে কৃষি-বন প্রবর্তন পদ্ধতি

বসতভিটায় বনায়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বসতভিটাগুলিতে বনজ, ফলদ, জ্বালানী কাঠ ও সবজীর আবাদ হয়ে থাকে। বসতভিটাগুলি একটি বাড়ী একটি খামার হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশের সকল বসতভিটায় কম-বেশী কৃষি-বনের প্রাকটিস হয়ে থাকে। কিন্তু উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বসতভিটাগুলি নতুন হওয়ায় সাধারণতঃ বৃক্ষশুন্য বা কম গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। সেখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র এবং তারা কৃষি কাজ, শ্রম বিক্রি বা মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের বসতবাড়ীতে কৃষি-বন প্রাকটিসের মাধ্যমে যাতে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা যায় এবং বসতবাড়িগুলির ভেজিটেশন বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য দেশের মধ্য উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলের তিনটি গ্রামে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আটটি কাষ্ঠ জাতীয় বনজ বৃক্ষ এবং ১১টি ফলদ বৃক্ষের চারা সহ মোট ১৯ প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয় এবং মৌসুমী শাক-সবজীর আবাদ করা হয়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, বসতভিটায় রোপিত কাষ্ঠ জাতীয় গাছের মধ্যে রেইন ট্রি, মেহগনি, আকাশমনি, নীম এবং কালো কড়ই এর বেঁচে থাকার হার আশাব্যঞ্জক এবং ফল জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঠাল, পেয়ারা এবং তেতুলের বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক। এর ফলে বসতভিটায় গাছপালার আচ্ছাদন বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বসতভিটায় শাক-সবজী আবাদ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি আয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

উপকূলীয় অঞ্চলের অগ্রতট (foreshore) এলাকায় পাম প্রজাতির বনায়ন কৌশল

বাংলাদেশের উপকূলীয় অগ্রতট এলাকায় অনেক অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি আছে যেখানে বছরে অন্ততঃ তিন মাস জোয়ারের পানিতে পাবিত হয়। ভূমিগুলি ম্যানগ্রোভ প্রজতির বাগান সৃজনের জন্য অনুপযুক্ত এবং অনুৎপাদনশীল। উক্ত ভূমিতে মূলভূমির ৪ টি পাম প্রজাতি যথা- তাল, নারিকেল, খেজুর এবং সুপারির বাগান সৃজনের উপর ১৯৯৯ সন হতে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। চারা রোপণের জন্য বিভিন্ন মডেলের ঢিবি প্রস্তুত করা হয় যাতে জোয়ারের পানিতে চারা ডুবে না যায়। নারিকেল ব্যতীত অন্যান্য প্রজাতির চারা পলিব্যাগে উত্তোলন করা হয়। জুন-জুলাই মাসে ১০-১২ মাস বয়সের চারা ঢিবির উপরে রোপণ করা হয়। পরীক্ষায় ৭.৩ মি. × ১.৮ মি. × ০.৫ মি. এবং ৭.৩ মি. ১.৫ মি. × ০.৫ মি. আকৃতির ঢিবিতে সকল পাম প্রজাতির বর্ধণ এবং জীবিতের হার খুবই ভাল পাওয়া যায়।

ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে কেওড়া বনের উৎপাদন বৃদ্ধি

ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সৃজিত বাগানের বৃদ্ধি ও উৎপাদন অঞ্চলভেদে ভিন্ন এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় কম। এর অন্যতম কারণ হলো উন্নতমানের বীজ ব্যবহার না করা। এ জন্য দেশের উপকূলীয় এলাকার পশ্চিমাঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি উপযোগী উন্নতমানের বীজের উৎস তৈরী করা হয়। বীজ উৎপাদন এলাকা হতে অভিযোজনের উপর ভিত্তি করে দুই ধরণের বীজের উৎস নির্বাচন করা হয়েছে যথা- উত্তম গাছের বীজের উৎস এবং নির্বাচিত গাছের বীজের উৎস। বাগানের অনেক গাছের মধ্য থেকে উত্তম গাছগুলিকে ভাল বীজের উৎস

হিসাবে নির্বাচিত করা হয় ফলে তাদের প্রতিকুল অবস্থায় টিকে থাকার বাড়তি ক্ষমতা আছে। প্রতিষ্ঠিত কেওড়া বীজ উৎপাদন এলাকার বীজ ব্যবহার করে ২০০৭ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার ৭ বছর পর ফলাফলে দেখা যায় যে, কেওড়া বাগান উত্তোলনের ক্ষেত্রে ভাল মানের অর্থাৎ বীজ উৎপাদন এলাকার ভাল বীজ ব্যবহার করে বনায়ন করলে সাধারণ বীজ দ্বারা উত্তোলিত বাগানের চেয়ে ৩.৪৬ গুণ কাঠের উৎপাদন বেশি পাওয়া যায়।

উপকূলীয় এলাকার উঁচু ভূমি ও বেড়ি বাঁধে বনায়নের জন্য ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন

উপকূলীয় এলাকার উঁচু ভূমি ও বেড়িবাঁধে বনায়নের জন্য ১৪ টি ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতির উপর ২০১৫ সাল থেকে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে রোপণের জন্য অর্জুন, কদম, হরিতকি, খয়ের, কাঠবাদাম, নিম, শিমুল উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। অন্যদিকে পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য খয়ের, অর্জুন, বকাইন, ছাতিয়ান, শিমুল, পুনিয়াল, পিতরাজ, হরিতকি, সোনালু, বহেরা, কদম এবং কালোজাম উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়।

উপকূলীয় ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় জনপদ ও অবকাঠামো রক্ষায় গবেষণার এ ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক গবেষণায় বেশ কিছু প্রযুক্তি ও তথ্য উদ্ভাবন করা হয়েছে যা টেকসই ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন এবং উপকূলীয় বনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপকূলে বন গবেষণায় ভবিষ্যৎ ভাবনা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় অনেক ভূমি এখনও পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। তাছাড়া কেওড়া বনের ভীতরে অনেক ফাঁকা স্থানের সৃস্টি হয়েছে। এসমস্ত ভূমিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির সাথে সাথে বাঁশ ও বেত প্রজাতির চাষাবাদ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বাঁশের ও বেতের পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন করা হয়েছে। প্রাথমিক ফলাফলে উপকূলীয় উঁচু ভূমির যেখানে জোয়ারের পানি খুব কম সময়ে প্লাবিত হয় এমন স্থানে বাঁশ ও বেত চাষে সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে গবাদিপশুর চারণক্ষেত্র হিসাবে উপকূলীয় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বনের ক্ষতি হচ্ছে কি না সে বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন্। অন্যদিকে বনায়ন ব্যর্থ হওয়া ভূমি ফাঁকা পড়ে আছে যার পরিমাণ অনেক বেশি। এ সমস্ত ফাঁকা ভূমিগুলোর সুষ্ঠ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য অধিক লবণ সহিষ্ণু ম্যানগ্রোভ ও নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন টেকসই বনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় বনের বর্ধনহারে জোয়ারভাটা এবং পলি পড়ার উপর কোনো প্রভাব আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

উপকূলীয় অঞ্চলের নতুন জেগে উঠা চরগুলোতে, স্থায়ী হওয়া উঁচু ভূমিগুলোতে এবং ফাঁকা ও পতিত ভূমিগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন এবং একটি টেকসই বন সৃষ্টি সম্ভব ।

তথ্যপুঞ্জি

1. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q.; Habib, M.A; Moula, M.G and Rasul, M.G. 2013. Growth performance of underplanting mangrove species in Sonneretia apetala (Keora) plantations along the western coastal belt of Bangladesh. Bangladesh Journal of Forest Sciences, 32(2):26-35.
2. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q; Habib, M.A. and Moula, M.G. 2014. Performance of some mainland trees and palm species planted in the coastal islands of Bangladesh. Journal of Asiatic Society of Bangladesh (science) 40 (1): 9-15.
3. Miah, M.A.Q ; Islam, S.A.; Habib, M.A. and Moula, M.G. 2014. Growth performance of Avicennia officinalis L. and the effect of spacing on growth and yield of trees planted in the Western coastal belt of Bangladesh. Journal of Forestry Research, 25 (4): 835-838.

4. Islam, S.A ; Miah, M.A.Q. and Habib, M.A. 2015. Performance of Mangrove Species Planted inside Sonneratia apetala Buch.-Ham. Plantations in the Coastal Belt of Bangladesh. Journal of Bioscience and Agricultural Research. Published: 25.02.2015 Vol. .03 (01) 38-44.

5. Islam, S.A ; Miah, M.A.Q. and Habib, M.A. 2015. Performance of Some Mangrove Species Planted inside Sonneratia apetala Buch.-Ham. Plantations in the Coastal Belt of Bangladesh. Indian Forester, 141 (4): 384-388,

6. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q.;Habib, M.A. and Rasul, M.G. 2015. Growth performance of Calamus tenuis Roxb. (Jali bet) in the coastal homesteads of Bangladesh. Journal of Bioscience and Agriculture Research, 04 (02): 74-79.

7. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q ; Habib, M.A. and Moula, M.G. 2015. Enrichment of Homestead Vegetation Through Agroforestry Practices in the Remote Coastal Areas of Bangladesh. Bangladesh Research publications Journal 11 (4): 276-283, September- December 2015.

8. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q ; Habib, M.A. and Mahabub, M.A. 2016. Growth and yield of Sonneratia apetala (keora) plantations raised from different seed sources in the central coastal belt of Bangladesh. Journal of Bioscience and Agriculture Research, 06 (02: 565-569.

9. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q; Habib, M.A. and Rasul, M.G. 2015. Growth and Development of Bambusa vulgaris Schrad. Ex. Wendl. Planted in the Coastal Homesteads of Bangladesh. Journal of Asiatic Society of Bangladesh (science) 41 (2): 123-131.

10. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q.; Habib, M.A and Moula, M.G. 2014. Pongamia pinnata (L.) Pierre- A promising Plantation Species for the Coastal Area of Bangladesh. Bangladesh Journal of Forest Sciences, 33(1 and 2):55-58.

11. Islam, S.A.; Miah, M.A.Q ; Mahabub, M.A. and Rasul, M.G 2016. Initial growth performance of ten woody medicinal tree species in eastern coastal belt of Bangladesh. Journal of Bioscience and Agriculture Research, 11 (01: 930-935.

12. Moula, M.G and Miah, M.A.Q 2020. Growth performance of some woody medicinal tree species in the western coastal belt of Bangladesh. Journal of Bioscience and Agriculture Research, Vol. 23, (01) : 1911-1919

চিত্র:১.পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার চর নজির (চর অগাস্তি) এলাকায় কেওড়া বনের অভ্যন্তরে উত্তোলিত পরীক্ষামূলক বাঁশ বাগান (১.৫ বছর)।

চিত্র: ২. রাঙ্গাবালীর সোনার চরে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো হেঁতাল ও গেওয়া প্রজাতি।

দুর্লভ পাখির সন্ধানে

আল্লামা শিবলী সাদিক, পাখিবিদ
শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি জাতীয় উদ্যান ও বনাঞ্চলে আমি পাখি দেখছি কয়েক বছর ধরে। ২০০৮ সালে আমি প্রথম গেছি কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে। ২০০৮ হতে ২০১১ পর্যন্ত প্রায় প্রতিমাসেই যেতাম, প্রতিবার পাঁচ-ছয় দিন, কখনও তার চেয় বেশী সময় কাটাতাম এই বনে। এ বনে বিরল অনেক বন্য প্রাণীর দেখা পাওয়া গেলেও পাখির সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য। এই বনে বিরল অনেক পাখির মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম বলতে হয় উদয়ী-বামনরাঙা (Oriental Dwarf Kingfisher) ও মালয়ী-নিশিবকের (Malazan Night Heron)। এ বন ছাড়া এদশের আর কোথাও এত সহজে বিরল এ দুটি পাখির দেখা মেলে না। এছাড়ও আছে বড়-মেটেকুড়ালি (Great Slatz Woodpecker)। এ পাখি অন্যত্র দুর্লভ হলেও কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে সহজেই দেখা যায়। ব্যাংছড়ির রাস্তা ও 'বনফুল' বন-বিশ্রামাগারের গাছে অনেকবার দেখেছি এ পাখি। এই বিশ্রামাগারের দোতলার বারান্দায় বসে কর্ণফুলী নদীর অপরূপ সৌন্দর্য যেমন উপভোগ করা যায়, তেমনই পাখিপ্রেমীদের কাছেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বসে থেকেই চারিপাশের গাছে দুর্লভ প্রজাতিসহ অনেক পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

বড়-মেটেকুড়ালি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কাঠঠোকরা এবং এরা বিশ্বব্যাপি বিপন্ন পাখির তালিকায় রয়েছে। আমি ২০০৯ সালে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে এই পাখিটি প্রথম দেখি। 'বনফুল' বন-বিশ্রামাগারের পাশেই গাছে বসে পাখিটি জোর গলায় ডেকে উঠেছিল। সেই থেকে ওই পাখির ডাকই আমার মোবাইল ফোনের রিংটোন। এই পাখি এতই দুর্লভ যে ফোনের রিংটোন শুনে জাবি ক্যাম্পাসে অথবা বার্ড ক্লাবের আড্ডায় কোন পাখি- দর্শক ভুলেও মনে করেনি যে পাখিটি ঢাকায় এসেছে। সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইনাম আল হকের সাথে বনফুল বিশ্রামাগারে ছিলাম। এক সকালে সামনের গাছে বড়- মেটেকুড়ালি ডাকছিল; কিন্তু ইনাম ভাই চেয়েও দেখলেন না। বুঝলাম, আমার ফোনের রিংটোন শুনে ঢাকায় মেটেকুড়ালি ডাকছে বলে কোনও পাখি-দর্শকের ভুল না হলেও কাপ্তাইয়ে মেটেকুড়ালির ডাক শুনে ফোনের রিংটোন মনে হতে পারে। আমি বললাম, 'ইনাম ভাই, এটা আমার ফোন না, 'গ্রেট-স্লেটি'। তিনি ক্যামেরা নিয়ে দৌড় দিলেন এবং বিশ্রামাগারের বারান্দা থেকে এই বিরল পাখির ছবি তুললেন। আঙ্গিনার গাছেই তখন তিনটি বড়-মেটেকুড়ালি ছিল।

উদয়ী-বামনরাঙা (Oriental Dwarf Kingfisher)

মালয়ী- নিশিবকের (Malayan Night Heron)

পাখি- দর্শক ও সৌখিন বন্যপ্রাণী ফটোগ্রাফারদের কাছে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের ব্যাংছড়ি খুবই পরিচিত একটি নাম। তবে এটি ২০০৯ সাল হতে বন্যপ্রাণী গবেষক ও পর্যবেক্ষকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাখি দর্শকের জন্য ব্যাংছড়ির বড় আকর্ষণ হলো সবুজ-ধুমকল (Green Imperil Pigeon) এবং ল্যাঞ্জা- হরিয়াল (Pintail Green Pigeon)। এখানে এ দুই বিরল পাখি সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। একসাথে অনেকগুলো সবুজ-ধুমকল এখানে সব

বড়-মেটেকুড়ালি (Great Slaty Woodpecker)

সময়ই দেখা যায়, যা বাংলাদেশের আর অন্য কোথাও এত সহজে দেখা যায় না। তবে পাখি ছাড়াও এখান থেকে বাংলাদেশের জন্য নতুন দুই প্রজাতির ব্যাঙের দেখাও পেয়েছিলাম। ২০১১ সালের শেষের দিকে প্রকৃতি ও জীবন দলের সাথে কাপ্তাই যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রকৃতি ও জীবন দলের উদ্দেশ্য ছিল কিছু বিরল পাখির দৃশ্য ধারণ। কিন্তু সকালে ব্যাংছড়িতে যাওয়ার পরেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, কারণ জায়গাটা আর চিনতে পারছিনা, অর্থাৎ চিরচেনা সেই সবুজ অরণ্য আর নেই, আছে শুধু সদ্য বনায়নের জন্য রোপিত চারা এবং পাখিদেরও আর খুঁজে পেলাম না। এই জায়গাটিতে প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে ওঠা কিছু গাছ থাকলেও বেশিরভাগই ছিল সৃজিত জারুল গাছ। জারুল গাছের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাকৃতিক বনের কিছু গাছ কেটে বাগান বানানো মোটেও কাম্য নয়। বড় গাছগুলো রেখে অবশিষ্ট ফাঁকা জায়গায় বনায়ন করা যেত। ঐসকল পাখির গুরুত্ব না জানার কারণেই হয়তো এমনটি ঘটেছে। ২০১৫ সালেও সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু আর সেই পাখিদের খোঁজ পাই নাই।

ল্যাঞ্জা- হরিয়াল (Pintail Green Pigeon)

২০০৯ সালে এপ্রিল মাসে এক পড়ন্ত বিকেলে প্রথমবারের মতো যাওয়া হয় কাপ্তাইমুখ বন-বিটে। রাতে বিশ্রামাগারে ছিলাম এবং খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই কর্ণফুলী নদীর পাশে একটি গাছে একসাথে অনেকগুলো উদয়ী-পাকড়াধনেশ (Oriental Pied Hornbill) দেখার সুযোগ হয়েছিল। ঢাকায় ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের দু-একজনের কাছে এ গল্পটি করেছিলাম, কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস করতে কঠিন হয়েছিল। ডক্টর রেজা খান স্যার একদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আসেন, সারাদিন স্যারের সঙ্গে ছিলাম এবং অনেক বিষয়ের সাথে কাপ্তাইয়ের বিরল প্রজাতির

সবুজ-ধুমকল (Green Imperil Pigeon)

পাখির কথা বলেছিলাম। স্যার সহজেই বিষয়টি বিশ্বাস করেছিলেন এবং কাপ্তাই যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। স্যার আমাকে সাথে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন কিন্তু পরীক্ষার জন্য যাওয়া হয় নাই, তবে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলাম। ২০১১ সালের জুন মাসে, স্যার একাই গিয়েছিলেন কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের সেই ব্যাংছড়ি, রাম পাহাড় সীতা পাহাড় এবং মুখ-বিটে। ডক্টর রেজা খান কাপ্তাই মুখ বিটের একটি গাছে একসাথে ৩৮ টি উদয়ী-পাকড়াধনেশ ও ব্যাংছড়িতে একসাথে ৩০ টি সবুজ-ধুমকল দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন যে এদেশে আগে কখনো এক গাছে বিরল পাখি এত বেশি সংখ্যায় দেখার ভাগ্য হয়নি তার। কাপ্তাই হতে ফিরে রেজা খান স্যার আমাকে ইমেইলের মাধ্যমে ধন্যবাদও জানান। কর্ণফুলী নদীর বাঁধের পাশে কাপ্তাইমুখ বনবিটের একটি গাছে আমি একবার ৪২ টি উদয়ী-পাকড়াধনেশ দেখেছিলাম। অত বড় সংখ্যা উল্লেখ করতে আমার কিছুটা শংকা হতো। ডক্টর রেজা খানের মন্তব্যের পর থেকে আমি নির্ভয়ে সংখ্যাটা বলতে পারি।

২০১১ সালের মে, জুলাই ও আগস্ট মাসে এই বনে সায়েম ও সামিউল ভাই বড়-মেটেকুড়ালি দেখেছিলেন কিন্তু এর ছবি নেওয়ার সুযোগ পাননি। তবে একই বছরে নভেম্বরে আমরা পাখিটিকে কাছ থেকে দেখেছি কক্সবাজার জেলার মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানে। দুটি মেটেকুড়ালি ডাকতে ডাকতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছিল, আবার ফিরে

আসছিল। প্রায় আধাঘণ্টা ধরে একই জায়গায় বসে আমরা এই অপরূপ দৃশ্য দেখেছি। এছাড়াও মেদাকচ্ছপিয়ায় সিঁদুরে-সাহেলীর (Scarlet Minivet) পুরুষ ও স্ত্রী পাখিকে একসাথে পেয়েছিলাম বেশ কাছেই।

ফাঁসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে আমি বলি পেঙ্গাখালী। এখানে বন মোটেই ঘন নয়; বড় গাছ তেমন একটা নেই। তবুও এই বিধ্বস্ত বনে খুব অল্প পরিসরে যে পাখি আছে তার মাঝে দু-জাতের পেঙ্গা চোখে পড়ে সহজেই। ভোরবেলা এলে অল্প সময়ে এখানে লাল ঘাড় পেঙ্গা (Rufous-necked Laughingthrush) এবং ধলা-ঝুঁটি পেঙ্গা (White-creasted Laughingthrush) দেখা যায়।

ধলা-ঝুঁটি পেঙ্গার দেখা পাওয়া অন্য কোথাও খুব একটা সহজ নয়। এখানে তিলা-নাগ ঈগলের (Crested Serpent Eagle) দেখা পাওয়াটাও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বনের প্রান্তে পাহাড়ি স্রোতস্বিনীর খাড়া মাটির পাড়ে গর্ত করে এক ঝাঁক খয়রা-গলা নাকুটি (Brown-throated Martin) বাসা বানায়। সেখানে এদের উড়াউড়ি দেখতে যাওয়টা আমাদের ফাঁসিয়াখালী সফরের শেষ আকর্ষণ।

ধলা-ঝুঁটি পেঙ্গা (White-creasted ughingthrush)

উদয়ী-পাকড়াধনেশ (Oriental Pied Hornbill)

বায়ু দূষণমুক্ত রাখতে গাছপালার ভূমিকা

আফতাব চৌধুরী
সাংবাদিক-কলামিস্ট

কৃতিত্বময় জীবনের অধিকারী হতে চায় সব মানুষ। অন্যের কৃতিত্বে গা জ্বললেও মূল কৃতিত্বটাকে সবাই পছন্দ করে। কৃতিত্বের অধিকারী হতে হলে মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। কৃতকর্মা হওয়ার জন্য যেসব জিনিষকে মানুষ নমুনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, তার একটি হল বৃক্ষ। বৃক্ষের দু'টি দিক মানুষের জন্য জীবন্ত আদর্শ। একটি বীজের বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ভাঁজে ভাঁজে বিছানো আছে বহু শিক্ষা, বহু গ্রহণীয় বিষয়। বৃক্ষ নিজের জন্মলগ্ন থেকে পরিণত পর্যায় পর্যন্ত সব ধরনের পক্ষপাত থেকে মুক্ত থাকে। বৃক্ষ নিজের অস্তিত্ব বিকাশায়নে কারো সঙ্গে পক্ষপাতের আচরণ করে না। একটি বৃক্ষ অপর এক বৃক্ষের বীজ থেকে জন্ম গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে সে বেড়ে উঠে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবেই। বেড়ে উঠার পথে সে বহু জায়গা থেকে সহযোগিতা নেয়, শক্তি সঞ্চয় করে। এতে তার কোনো সঙ্কোচ নেই, নেই অভিমান ও পক্ষপাত। সে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে। আকাশ ও মেঘ থেকে সঞ্চয় করে পানি। বায়ুমন্ডল থেকে বাতাস টেনে নেয়। জমি থেকে চুষে নেয় মাটি ও উর্বরতা। এসব জিনিষের দানে ও অবদানে ক্রমে বিকশিত হয় একটি বৃক্ষ। ফলে একটি সামান্য বীজ একটি বিশাল ছায়াবিস্তারী বৃক্ষে পরিণত হয়। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কোনো বৃক্ষ বড়াই ও পক্ষপাতের আশ্রয় নেয় না। অন্যথায় কখনো একটি বীজ বৃক্ষ হতে পারত না।

বৃক্ষের মাঝে আমাদের জীবনের জন্য আরেকটি আদর্শ হল তার সহনশীলতা ও পরোপকার। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হলেও সে আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। বৃক্ষের জন্মলগ্নের দিকে তাকালে দেখতে পাই, একটি বীজ পচা-দুর্গন্ধময় মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, অথচ সে কোনো অভিযোগ করে না। মানুষের এ অবিচারের বিরুদ্ধে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে না। বৃক্ষরোপনের কিছুদিন পর পেয়ে যায় চেষ্টার সুফল, মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় জমির উপর। কেমন বিশ্রী ন্যাংড়াভাবে গজিয়ে উঠে একটি চারা। পরে সে গাছ হয়, যোগ দেয় সবুজের সমারোহে। মানুষকে দান করে ফুল, ফল, কাঠ ও অক্সিজেন। পুরো জগৎকে ভরিয়ে তুলে বসন্তে। রূপ-রস-গন্ধের নিটোল সমারোহ পৃথিবীকে মর্মরিত করে, ফলে মানুষের মন-মন্দির আকুলতায় হয়ে উঠে আবেশমুগ্ধ। এছাড়াও বৃক্ষ রক্ষা করে পরিবেশের ভারসাম্য। তাই বৃক্ষের বুকে যে অদম্য বল ও উদারতা, তার তারিফ না-করে উপায় নেই। মানুষ তার গায়ে পাথর মারে, লোহা মারে কিন্তু সে তাদেরকে উৎসর্গ করে নিজের ফল। রৌদ্রে সে ঝলসে যায়, কিন্তু মানুষকে দান করে শীতল ছায়া। সর্বোপরি যখন তাকে কেটে ফেলা হয়, তখনও সে ভোলে না চিরবন্ধু মানুষকে। বিচিত্র ফার্নিচার হয়ে আলোকিত করে মানুষের ঘর। আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন, তবুও আপনাকে ভুলে না, আপনাকে দান করে আলো ও তাপ। মানুষ ও বৃক্ষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এক নিবিড়তম সম্পর্ক, রয়েছে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা। বিশেষ করে মানুষ ও উদ্ভিদের পরস্পরের দেহোপযোগী সামগ্রীর জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে বিনিময়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে। পৃথিবীতে বৃক্ষের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকলে এক সময় মানুষের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষও যদি বৃক্ষের মতো সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও পক্ষপাতের পক্ষাঘাত ব্যাধি থেকে মুক্ত থেকে সেবা করে যায় এবং বৃক্ষের মতো নিজের স্বভাব গড়তে পারে, তা হলেই সে অর্জন করতে পারে মহত্ত্ব ও মর্যাদা, লাভ করতে পারে উত্তম প্রতিদান, পেতে পারে আখেরাত-জগতের ফলে-ফুলে ভরা জান্নাতের বাগান।

গাছ অবশ্যই জমির অলঙ্কার। গাছের অলঙ্কার পাতা। পাতা হল গাছের পোশাক। এ পাতাই ডালকে উলঙ্গতা থেকে রক্ষা করে। সে সঙ্গে রেশমের মতো তুলতুলে মসৃণ সাজ পরিয়ে তাকে অলংকৃত করে। আমাদের দেশে তো প্রায় গাছের রং সবুজ হয়ে থাকে। শুনেছি ও দেখেছি আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে কোনো কোনো মৌসুমে পাতার রঙ হয়ে যায় লাল, সবুজ ও বাদামি।

শরৎকালের শাসনে এসব রং-বেরং-এর পাতাগুলো ঝরে যায়, এমনকী গ্রীষ্মকালে গাছগুলো একেবারে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। আবার কিছুদিন পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় বসন্ত। আবার নতুন পাতা, নতুন মুকুল, নতুন রং, নতুন আর নতুন,

নতুনের সমারোহ। সবুজের সাজে, নব সাজের স্রোতে প্লাবিত হয় পুরো জমি। সবুজের সমারোহ মাতিয়ে তোলে আকাশকে। আকাশ এ দৃশ্য দেখে ভালবাসার উত্তাপে বিগলিত হয়। ভালবাসার বৃষ্টিবর্ষণ নিবেদন করে জমির কাছে। গাছের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনি। ঝুলে থাকা গাছের ডাল থেকে একটি পাতা ঝরে আপনার সামনে পড়ল। পাতাটি হাতে উঠালেন। এ রকম হয়তো অনেকবার হয়েছে আপনার জীবনে। আপনি এ পাতা হাতে তুলে চিন্তা করুন বা নাই করুন, সে কিন্তু প্রকৃতির নীরব ভাষায় আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে। কী শিক্ষা? প্রতিটি মানুষ পৃথিবীর বাগানে একটি পাতার মতই ফুটেছিল। যে বাগানে তার ফোটা, সে বাগানে গ্রীষ্মও অবধারিত। গ্রীষ্ম ধেয়ে আসছে দ্রুত। আজ নয় কাল আপনার বাগানকে শুনসান করে দেবে গ্রীষ্মের গর্বে একদিন হারিয়ে যাবে বাগানের গৌবর।

গাছের এক অংশ শেকড়, যা মাটির নীচে থাকে প্রোথিত, আরেক অংশ তার শাখা-প্রশাখা, যা লোকচোখে স্পষ্টায়িত। কারও কারও মন্তব্য, গাছের যেটুকু অংশ জমির উপর থাকে, তার প্রায় সমান অংশ শেকড়ের আদলে জমির নীচে লুক্কায়িত থাকে। গাছ নিজের অস্তিত্বের অর্ধেকাংশকে সবুজ-শ্যামল চেহারায় ততক্ষণ পর্যন্ত জমির উপর দাঁড় করাতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের দ্বিতীয় অর্ধেকাংশকে জমির নীচে প্রোথিত করার জন্য স্বেচ্ছায় প্রস্তুত না থাকে। গাছের এ আদর্শটি মানবজীবনের জন্য সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে বড় শিক্ষা। এখান থেকে মানুষ বুঝে নিতে পারে, জীবন-বিনির্মাণ ও দৃঢ়ায়নের জন্য তাকে কী কী করতে হবে।

শেকড় নীচের দিকে, আর ফল উপরের দিকে-এ হল স্রষ্টার অমোঘ নিয়ম। গোলাপ ফুল রং ও সুগন্ধির এক মানদন্ডিক সমষ্টি, যা প্রকাশ পায় শেকড়ের মাধ্যমে নয়, শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে। কিন্তু গোলাপের এ মান ও মানদন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হয়নি। এ জন্য গোলাপ গাছের একটি শেকড়কে হারিয়ে যেতে হয়েছে মাটির নীচে। তবেই না সে ছড়াতে পারে মন মাতানো ঘ্রাণ। গাছের সব শক্তি মূলত শেকড়েই। সে শেকড়কেই সমাধি দিতে হয় কাদার নীচে। শেকড়ের এ স্বেচ্ছাসমাধিতেই জীবন লাভ করে নতুন এক শক্তি। আমরা তৃপ্তিভরে ফল খাই, ফুলের গন্ধে মেতে উঠি, শেকড়ের আত্মোৎসর্গের কথা ও সচ্ছতলার আশায় মত্ত হই, কিন্তু ভুলে যাই সাধনভূমির গভীরে শেকড় জমানোর কথা। গাছ জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সে জমির নীচে নিজের শেকড় আমানত রাখে। গাছ নীচ থেকে উপরের দিকে বাড়ে, উপর থেকে নীচের দিকে নয়। গাছ স্রষ্টার কুদরতের ভাষা-শব্দহীন এক শিক্ষক। তার দেওয়া শিক্ষা মহান ও মূল্যবান। মানবজাতির পাঠশালায় তার শেখানো অমূল্য পাঠ; পৃথিবীতে অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে দু'ধরনের গাছ রয়েছে। এক, ফলবান গাছ। দুই, ফলহীন গাছ। ফলহীন গাছ লতা-পাতাময় গাছ। ফলহীন গাছ বা লতা মাসের ভেতর বড় হয়ে মাসের ভেতরে মরে যায়। পক্ষান্তরে গাছ বড় হয় বহু বছরে। তাই সে জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বহু বছর, এমনকি শতাব্দী পর্যন্তও। দু'ধরনের গাছের সৃষ্টি অহেতুক নয়। এতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে জীবন ও জগতে সফলতা অর্জনের কলকব্জা শেখার জন্য।

জীবন ও জাতির বিনির্মাণে আমাদের লাউয়ের লতার মতো ছড়ালে হবে না, বাড়তে হবে গাছের মতো শক্ত মাটিতে শেকড় চারিয়ে, দীর্ঘ জীবনের আশায় বুক বেঁধে। লাউয়ের লতা দিনে দিনে বাড়ে। মাসের ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ে বিশাল জায়গাজুড়ে। কিন্তু মাসের ভেতরেই আবার শুকিয়ে মরে যায়। প্রথম লাফে যত দীর্ঘ জায়গাই পার হোক মাস খানেকের ব্যবধানে তাকে দেখা যায় মানুষের পায়ের তলায় দলিত হতে। পক্ষান্তরে গাছ বাড়ে খুব ধীরে। বছরের পর বছর পার হয়ে পরিণত হয় একটি বৃক্ষে। সে পরিমাণে তার শেকড়ও মজবুত হতে থাকে মাটির পেটে। সে শেকড় মাটির গভীর থেকে নিজের খোরাক সঞ্চয় করে। এসব চেষ্টা ও কৌশলের পরেই একটি বৃক্ষ বিকশিত হয়ে বেঁচে থাকে বছরের পর বছর, এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী। তেমনিভাবে মানুষের জীবন ও জাতির স্থায়ী নির্মাণে বিস্তৃতির চেয়ে দৃঢ়তাই বেশি প্রয়োজন। দৃঢ়তা ছাড়া বিস্তৃতি মানে ভিত্তিহীন ঘর। আর ভিত্তিহীন ঘরের মতো জীবন গড়লে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অধিকারে তো আসেই না , বরং তাতে রয়ে যায় ফাঁক ও ফাঁকি।

মানুষের জীবনে গ্রহণ করতে হয় গাছের জীবন বিকাশের ধীর অথচ দৃঢ় ধারাটি। আমরা যদি জীবনের শক্তিশালী ও স্থায়ী নির্মাণ চাই, তা হলে কষ্ট, সাধনা ও ধৈর্যের পাহাড় ডিঙ্গাতে হবে। জীবনকে যদি শিশুদের খেলাঘর মনে করি, তাহলে মুহূর্তে তা গড়া যাবে ঠিক, কিন্তু আবার মুহূর্তেই তা ভেঙে পড়বে। গড়তে যত না সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে তা মিশে যাবে মাটির সঙ্গে।

এক সবুজ আগামীর লক্ষ্যে ‘বনায়ন’

আহমেদ রায়হান আহসানউল্লাহ
প্রতিনিধি, “বনায়ন” মহাখালী, ঢাকা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশ ও জীবনযাত্রা যখন হুমকির মুখে তখন বাংলাদেশ সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে ‘বনায়ন’ প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রকল্পটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক সবুজ আগামী তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ সবুজায়ন, সামগ্রিক বৃক্ষাঞ্চল বৃদ্ধি ও সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ১৩-ক্লাইমেট অ্যাকশন; এসডিজি ১৫-লাইফ অন ল্যান্ড) অর্জনে সরকারের বেসরকারি পর্যায়ের এক বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে নিরলস কাজ করে চলেছে এই প্রকল্প।

এই বছর, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই প্রকল্পটি ৪২ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে এক সবুজ আগামী নির্মাণে সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আসছে এই কর্মসূচি। যার মধ্যে বন অধিদপ্তর, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম।

২০২১ সালে মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অপরূপ মাহেন্দ্রক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে এবং বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহী, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, রাঙামাটি, মানিকগঞ্জ সহ মোট ১২টি জেলায় বন অফিসে বিতরণের উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার গাছের চারা পৌঁছে দিয়েছে এই প্রকল্প। সংশিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক, জেলা বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

বনায়ন প্রকল্পের উলেখযোগ্য কাজ গুলোর মধ্যে লালন শাহ সেতু কুষ্টিয়া, হজরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম, লামা-আলীকদম মহাসড়ক, রোহিঙ্গা ক্যাম্প উখিয়া কক্সবাজার, মিরিঞ্জা পয়েন্ট, লামা বান্দরবান, কুষ্টিয়া -যশোর মহাসড়ক, জি.কে. ক্যানেল, যমুনা ব্রিজ, কুষ্টিয়া বাইপাস রোড ইত্যাদি অন্যতম। বর্তমানে প্রকল্পটি ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহী, লালমনিরহাট, নাটোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, যশোর, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙামাটি, নোয়াখালী সহ আরও বেশ কয়েকটি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে।

উলেখ্য যে, উখিয়ায় অপ্রত্যাশিত রোহিঙ্গা বসতি ও জনসমাগমে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় এক সময়ের চিরসবুজ প্রকৃতি। বিপুল বাসস্থানের চাপ সামাল দিতে প্রয়োজন হয় কাঠ ও বাঁশের। ফলে প্রকৃতি হারিয়ে বসে তার চিরচেনা রূপ। ২০১৮ সালে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন উক্ত অঞ্চলে পুনর্বনায়নের উদ্যোগ হাতে নেয়। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্মিলিতভাবে ‘বনায়ন’ প্রকল্প ২০১৮ সাল হতে অদ্যাবধি কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রায় ২২ হেক্টর বকে এবং ১৫.৫ কিলোমিটার রাস্তার পাশে ২ লক্ষ ১০ হাজার গাছের চারা রোপন করে যা সময়ের পরিক্রমায় বৃদ্ধি পেয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চিরচারিত সবুজ ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে ।

নেইলসন কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৬ সালে পরিচালিত এক রিসার্চে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ‘বনায়ন’ এর সুপ্রভাব উঠে এসেছে। গবেষণা বলছে, বিএটি বাংলাদেশ বৃক্ষরোপণ প্রকল্প থেকে চারা সংগ্রহ করেছেন এমন সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৭৭ভাগ মানুষ বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে আয় করছেন এবং ৩৩ ভাগ সুবিধাভোগী বৃক্ষ রোপন থেকে প্রাপ্ত অর্থ অন্য কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করছেন। এছাড়াও দেশব্যাপী বর্ধিত গাছের সংখ্যার কল্যাণে বৃক্ষ রোপন হয়েছে এমন শতকরা ৯৭ ভাগ অঞ্চলে পরিবেশগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত গণসচেতনতা সৃষ্টিতেও ‘বনায়ন’ প্রকল্পটি সফল ভূমিকা পালন করছে।

বৃক্ষরোপণে অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় স্বীকৃতি হিসেবে, বনায়ন প্রকল্প ১৯৯৩, ১৯৯৯, ২০০২, ২০০৫, ২০১৯ সালে পাঁচবার মর্যাদাপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার এবং ২০০৭ সালে একবার প্রধান উপদেষ্টার পুরস্কার অর্জন করেছে। ২০২১ সালে, প্রকল্পটি 'বেস্ট ইনোভেশন এসডিজি ইনক্লুশন' বিভাগের অধীনে 'বেস্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস-২০২১'-এ ভূষিত হয়েছে। বনায়ন প্রকল্পটি গ্রীন লিডারশিপের অধীনে ২০১৪ সালে এশিয়া রেসপন্সিবল এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে।

বনায়ন প্রকল্পটি সকলের জন্য এক সবুজ আগামী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের সাথে কাজ করে এগিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০২১ সালে মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অপরূপ মাহেন্দ্রক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে এবং বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে চারা বিতরন কর্মসূচি

কুষ্টিয়া বাইপাস রোড, ২০১৯ সালে মর্যাদাপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে

আমাদের লোকজ উদ্ভিদের লোকায়ত ব্যবহার

ড. সানজিদা মুবাশ্‌শারা
অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২

ড. মোঃ জাহিদুর রহমান মিয়া
পরিচালক, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা

লোকজ শব্দটির অর্থ হল সাধারণ জনগণ হতে উদ্ভুত, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত যা একান্ত ভাবে পল্লিবাসী ও পল্লী অঞ্চলের নিজস্ব ভাব বিশিষ্ট্য বহন করে। লোক সহিত্য, লোক গাঁথা, লোক শিল্প, লোক গান ইত্যাদির ন্যায় লোকজ উদ্ভিদও আমাদের পল্লীবাসী ও পল্লী অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ। ঐতিহ্যবাহী, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর উদ্ভিদজাত নানান সামগ্রী গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে, বনে বাদাড়ে অযত্ন-অবহেলায় হারিয়ে যেতে বসেছে। আজ সময় এসেছে এ সকল অমূল্য সম্পদকে সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে পরিচিত করা, এদের সার্বিক পরিচর্যায় মনোনিবেশ করা এবং এদের গুনাগুণ বিশ্লেষণ করা।

অনামী অথচ পুষ্টিকর লোকজ উদ্ভিদ সামগ্রীর অধিকাংশেরই উৎস কিন্তু আমাদের বহুল পরিচিত ও প্রচলিত উদ্ভিদরাজি। একটি প্রচলিত গানের কথায় আছে- 'যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে/যে দেশেতে কলমী কমল কনক হয়ে হাসে'। শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। Nymphaeacec গোত্রের সাদা বর্ণের এ শাপলার বৈজ্ঞানিক নাম হল *Nymphaeapubesenes*। শাপলার পুষ্পনালকে সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়ার প্রচলন আছে আমাদের মাঝে। শাপলার নাল ৮/৯ ফুট লম্বা, নরম ও স্পঞ্জি হয়। ফুলের পাপড়িও বড়া ভেজে খেতে দেখা যায়। গ্রামে গঞ্জে মানুষের মাঝে এক সময় প্রচলিত ছিল ঢ্যাপের খৈ। এই ঢ্যাপ হল শাপলার ফল, দেখতে ততটা সুন্দর না হলেও গোলাকৃতির ফলটিতে রয়েছে মন্ডের মত সাদা বর্ণের শাঁস যাতে বাদামী বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র বীজ সাজানো থাকে। বীজ দেখতে সরিষা বীজের মত। বীজ শুকিয়ে খৈ ভাজা হয় যা দিয়ে নাড়ু তৈরী হয়। এটি গ্রামবাসী ও আদিবাসীদের প্রিয় খাবার। পদ্মের (*Nelumbo nucifera*) ফলও আদিবাসীরা খাদ্য হিসেবে ব্যাবহার করে। সকল প্রকার আমাশয় ও বদ হজমে এগুলি ব্যবহৃত হয়। গ্রাম গঞ্জের হাটে বাজারে এক সময় খুব শালুক পাওয়া যেত। গ্রামবাসীরা বিল, হাওর, বাওড় থেকে তুলে আনতো এ শালুক এবং শালুক ফল হিসেবে পরিচিত ছিল। শালুক আসলে ফল নয়। এটি শাপলা ফুলের অনেকগুলো গোড়া অর্থাৎ রাইজোম একত্রিত হয়ে গুটি আকৃতির হয়। কালো আবরণের খোসার ভিতর হালকা বাদামী বর্ণের শক্ত শাঁস থাকে। এটি একসময় সিদ্ধ করে বা আগুনে পুড়িয়ে ভাতের বিকল্প হিসেবে খেত গ্রামবাসীরা। বর্ষাকালে জলাশয়ের নীচু জমিতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় এরা। এটি হজম শক্তি বৃদ্ধিকারক, ক্ষুধা নিবারক ও শক্তিদায়ক হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। চুলকানি ও রক্ত আমাশয় নিরাময়ে এটি ব্যবহৃত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ,ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। এছাড়াও একসময় **মাখনা** (*Euryale ferox*), পানিফল বা পানি সিঙ্গারা (*Trapabicornis)* ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী ফলের বিশাল ভান্ডার ছিল আমাদের জলাশয়গুলি। পানি ফলের গাছে বেশ কাঁটা থাকে। ফলগুলি কালো সবুজ বর্ণের। খোসা ছাড়ালে সাদা শাঁস বেরিয়ে আসে। মখনার খৈ একটি উপাদেয়, সহজপাচ্য, বলকারক ও রোগীর পথ্য হিসেবে আদর্শ খাবার। দুঃখের বিষয় নানান বৈরিতায় এ সকল জলজ সম্পদ প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

আমাদের দেশের সর্বত্র বিস্তৃত গ্রামিনী গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ আমাদের জাতীয় সম্পদ। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিক ভাবে জন্মানো মূলি (*Melocanna baccifera*), ডুলু (*Neohouzeaue dulloa*), মিতিঙ্গা (*Bambusa tulda*), ফারুয়া (*Bambusa polymorpha*), পেকুয়া (*Dendrocalamus hamiltonii*), ওঁরা (*Dendrocalamus longispathus*) ইত্যাদি বাঁশের কোড়ল আদিবাসীদের অতি প্রিয় খাদ্য। কোড়ল হল নতুন বাঁশের কুড়ি। নতুন গজিয়ে ওঠা বাঁশের গোড়ার নরম কচি অংশ বা অংকুরকে বলে বাঁশকোড়ল। বর্ষার বৃষ্টিতে

মাটি নরম হলে গজাতে থাকে আর উচ্চতায় ৫/৬ ইঞ্চি হলে খাবার উপযোগী হয় বাঁশ কোড়াল। কলার মোচার মতই পরতের পর পরতের ভিতরে আছে নরম কোড়ল। বাজারে আবরণসহ এবং আবরন ছাড়া দুই রকমই পাওয়া যায়। শুধু বাংলাদেশে নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এটি প্রসিদ্ধ। চীন, জাপান, কোরিয়া, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ডে এটি বেশ জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী খাবার। জাপানে একে বলে তেকেনাকো এবং ইরেজিতে Bamboo shoot নামে পরিচিত। এটি শরীর ঠান্ডা করে এবং খাওয়ার রুচি বাড়ায়, শরীর জ্বালা, স্কর্ভি ও ইউরিনের সমস্যা সমাধানে বেশ উপকারী। এতে কোলেস্টরল নাই বললেই চলে। এতে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসইড নামক ন্যাচারাল টক্সিন থাকে। তবে রান্নার পূর্বে সিদ্ধ করলে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়।

Musaceae পরিবারভুক্ত একবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী, বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ কলা গাছ বর্তমানে আমাদেও উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। সুদূর অতীতে বিদুষী মেয়ে খনার প্রশংসা বচন-" তিনশ ষাটটি কলা রুয়ে/ থাকগে চাষা মাচায় শুয়ে/ কলা রুয়ে না কেটো পাত/ তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।" আজ যেমন সত্য প্রমাণ করেছে আমাদের কলা চাষীরা তেমনি অমৃত সাগর, রঙীন সাগর, মেহের সাগর, শবরী, চিনি চম্পা প্রভৃতি কলার সম্ভারে হারিয়ে গেছেআমাদের বাড়ীর গাছের কবরী বা ঠোঁটেকলা, কাঠালী কলা (পূজায় ব্যবহার হয়), আইটা বা বিচি কলা, পাহাড়ী কলা, বাংলা কলা বা গ্যাড়া শংকর কলা, মর্তমান কলা, কাচ কলা ইত্যাদি। আগুনের মতো লাল লালকেল বা অগ্নিশ্বর কলাএখন আর চোখে পড়ে না। আর কলার থোড়, মোচার মত সুস্বাদু আর পুষ্টিকর সবজি হারিয়ে যাচ্ছে সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে। গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয় থোড়হল কলা গাছের কান্ডের মধ্যের গোলাকার অংশ যা অনেকগুলো মেকী কান্ড (Pseudostem) এর পারতে আবৃত। এই আবরণগুলি সরিয়ে ফেললে আসল থোড় বেরিয়ে আসে। এটিকে কেউ বলে কাঞ্জাইল বা কান্দাইল, কেউ বা বলে বোগোলি তবে অধিকাংশই থোড় নামে চেনে। এতে কষের পরিমান বেশি তাই কাটার সময় বিশেষ পদ্ধতিতে রাধুনীরা হাতে পেঁচিয়ে তা সরিয়ে ফেলে। এতে প্রচুর পরিমানে ফইবার, পটাশিয়াম, আয়রন ও ভিটামিন B_6 আছে। অরুচি, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস, হাইপার এসিডিটি, বড়তি ওজন, মুত্রনালীর সংক্রমন, কিউনী পাথর, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা রকম রোগ ব্যধি নিরাময় ও প্রতিরোধে এটি খুবই উপকারী। আর কলার মোচাহল বহিরাবরণে ঢাকা কলা ফলের মঞ্জুরী। কলার কাদিও একেবাওে শেষ প্রান্তে থাকা না ফোটা ফুলের কুড়ি সমগ্রকে আমরা মোচা বলি যার পরতে পরতে থাকে ক্ষুদে কলার গুচ্ছ। রঙীন ও সাদা আবরণ ফেলে বের করে আনা হয় কীলক আকৃতির অংশ। এর সঙ্গেঁ ক্ষুদ্র গুচ্ছকলাগুলি কুচিয়ে রান্না করা হয় সবজি হিসেবে। দারুন সব পুষ্টি উপাদন আছে কলার মোচায়। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ফইবার, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, থিয়ামিন, রিবোফ্লাভিন এবং আছে পর্যাপ্ত ভিটামিন A,C এবং E। এর পটাসিয়াম হাইব্লাডপ্রেশার কমায়, আয়রন রক্ত শূন্যতা হতে দেয় না, ম্যাগনেশিয়াম বিষন্নতা দূর করে, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস দাত ও হাড় ভালো রাখে। এটি ব্লাড সুগার ও ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক রাখতে সহায়তা করে ফলে ডায়াবেটিস বাড়তে দেয় না। এছাড়া সংক্রমন ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধেও এগুলি বেশ উপকারী ভূমিকা রাখে। এছাড়া কলাপাতা মুড়ে পাতুরী রান্না কিংবা কলা পাতা পেতে খাওয়ার ঐতিহ্য আমরা প্রায় ভূলতে বসেছি আর বর্তমান প্রজন্ম তো জানেই না এর সৌন্দর্যের পরশ।

আলু আমাদের সবচেয়ে প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত সবজি যা সব তরকারিতেই স্থান পায়। অঞ্চল ভেদে এই আলুরও নানান জাত বা ভ্যারাইটির দেখা মেলে যেমন- টেপা আলু, জাম আলু, শিল আলু ইত্যাদি। তবে সমগোত্রীয় না হয়েও এক ধরনের অপ্রচলিত কন্দাল মূল তার নামের শেষে আলু তকমা ধারণ করেছে যা অঞ্চলভেদে চুপড়ি আলু, গাছ আলু, খাম আলু, ঝুম আলুইত্যাদি নামে পরিচিত। Diascoraceae পরিবারভুক্ত এ কন্দ, সবজি হিসেবে আদিবাসী ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিকট খুবই সমাদৃত। মাটির নীচে জন্মায় তাই মাটি আলু বা মাইট্রা আলু নামেও পরিচিতি পেয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয়ইয়াম, বৈজ্ঞানিক নাম *Diascorea alata*। তবে এর আরও কয়েকটি ভক্ষণযোগ্য জাত রয়েছে। এ গাছের অর্ধবায়বীয় কান্ডের পাতার কক্ষে বুলবিল লক্ষণীয় যা গ্রামের ছেলেমেয়েরা পুড়িয়ে খায়। এতে রয়েছে প্রচুর পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও আয়রন। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন, ফ্যাট ও ফাইবার আছে এতে। খেতে খুব সুস্বাদু এ বিশেষ ধরনের আলুটি কিন্তু আফ্রিকার কোন কোন দেশের প্রধান খাদ্য। কাসাভা প্রচুর কার্বহাইড্রেটও ক্যালরি সমৃদ্ধ কন্দ

জাতীয় সবজি যা অঞ্চলভেদে নানানভাবে খাওয়া হয়। এতে প্রচুর স্টার্চ ও ভিটামিন থাকে। বৈজ্ঞানিক নাম *Manihot esculenta*। এছাড়া ভাত ও শর্করা জাতীয় খাদ্যেও পরিবর্তে ব্যবহৃত মিষ্টি আলুনামের কন্দাল মূল প্রাগঐতিহাসিক যুগ থেকে সবখানে প্রচলিত। রঙিন আবরণের এই সবজিটিকে রাঙা আলুও বলে কোথাও কোথাও। ইংরেজি নাম sweet potato এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Ipomea botata*। এই সবজিটিতে ফ্যাট নাই বললে চলে। এতে পর্যাপ্ত ক্যালরি, শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, পানি ও আঁশ থাকায় দারুন এক সুষম ও পুষ্টিকর খাবার। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু এর খাওয়ার প্রক্রিয়াও সহজ। সেকে, ভাঁপে, সিদ্ধ করে, পুড়িয়ে নানাভাবে খাওয়াযায় এমনকি এ দিয়ে রুটি, বিস্কুট, পায়েস, সুপ ও তরকরী বানিয়ে খাওয়া যায়। মিষ্টি স্বাদযুক্ত হলেও এটি কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদেও জন্য ক্ষতিকর নয়। এটি ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক রেখে রক্তের চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রনে কর্যকর। সিদ্ধ করে খেলে এর বিটা ক্যারোটিন হজম হয় আর রক্তে গ্লুকোজ কম মেশে। এরা শক্তি বাড়ায় আর ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বিপদজনক উপাদানগুলি পরিপাক নালী থেকে শুষে নেয়। এছাড়া অ্যাজমা, ব্রংকাইটিস, আরথ্রাইটিস, ব্যথা, বেদনা, বাতসহ বাড়তি ওজন, ডিহাইড্রেশন, নানারকম রোগ বালাই মোকাবিলার দারুন সব ঔষধি গুণ আছে এই মিষ্টি আলুতে। শাক আলুতে ৮০% এর বেশি পানি থাকে। এছাড়া খনিজ লবণ, ভিটামিন এ, বি, সি, ফাইবার এবং অল্প পরিমাণ আমিষ, শর্করা ও স্টার্চ থাকে। দেহের পুষ্টি সাধনে তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শাক আলু নামের একটি অপ্রচলিত ফসল যা খোসা ছাড়িয়ে সরাসরি কাঁচা খাওয়া যায়। এটি খুব রসালো ও মিষ্টি। খোস হাত দিয়ে টান দিয়ে সহজে খুলে ফেলা যায়। ভেতরের শাঁস কচকচে ও সাদা। কাঁচা অবস্থায় চিবিয়ে খেলে প্রচুর পানি বের হয়। অঞ্চলভেদে এটিকে চিনি আলু, ঠান্ডা আলু, জলপান আলু বলা হয়। এটি লতা জাতীয় সীম গোত্রের অর্থাৎ, Fabaceae গোত্রের উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম *Pachyrhizus tuberosus* , ইংরেজিতে বলা হয় Yam bean। এর আরও কয়েকটি প্রজাতি আছে। এটি মূলত মূল জাতীয় সবজি।

ইংরেজিতে Taro বলে পরিচিতকচুর বৈজ্ঞানিক নাম *Colocasia esculenta*। আমরা অখাদ্য বা বাজে জিনিস বুঝাতে কচু ঘেচু কথাটি বলে থাকি। আমাদের কৃষি শিল্পে অবমূল্যায়ন হলেও খাদ্য রসিকদের কাছে কচু কিন্তু উপাদেয়। বর্তমানে কচুকে উৎকৃষ্ট বলে সকলে মানে ও জানে। Araceae গোত্রের নানান প্রজাতির কচুকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় aroids। বিভিন্ন জাতের কচু সামগ্রীর মধ্যে জনপ্রিয় হল কচুরমুখী, কচুর লতি, কচুর ডাটা ও কচুর শাক। এছাড়া শোলা কচু, পানি কচু, দুধ কচু এগুলি সচারচার সব বাজারেই পাওয়া যায়। কচুর লতি হলো কচু গাছের (Taro) একধরনের মূল বা stolon যা পুষ্টিগুণে ভরা। এতে প্রচুর ডায়াটারি ফইবার, আয়রন, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি ও ডি আছে। এর খাদ্যগুণ তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও হজম শক্তি বাড়ায়, চর্ম রোগ, রক্ত শূন্যতা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, বড়তি ওজন কমায়, হাত, হড় ও চুল মজবুত করে। কচুর মূখী হলো মূখী কচুর গুড়িকন্দ থেকে বের হওয়া কন্দাল শাখা বা অঙ্গমুখী (Carmel) যা প্রচুর স্টার্চ ও ডায়াটারি ফইবার সমৃদ্ধ। কচুর পাতায় ও ডাটায় পর্যাপ্ত থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, আয়রন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক সমৃদ্ধ। এছাড়া এতে প্রচুর ভিটামিন B_6, ভিটামিন C এবং নিয়ামিন থাকে। আর পানি কচু, দুধ কচু, শোলা কচু, কাঠ কচু, মান কচু, ওল কচু ইত্যাদি নানান জাতের কচু অঞ্চলভিত্তিক প্রাধান্য পায়। খাওয়ার উপযোগী অংশ হলো কচুর মাটির নীচের স্ফীত মূল থাকে গুড়ি কন্দ বা corm বলে। উন্নতমানের কচু স্টার্চ সমৃদ্ধ সবজি হিসেবে এর চাহিদা প্রচুর। ইহা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন এ ও ভিটামিন বি এর দারুন উৎস। দক্ষিণাঞ্চলের অপ্রচলিত সবজি হিসেবে মান কচু ও ওল কচুর উল্লেখ না করলেই নয়। একদিকে স্বাদ ও অন্যদিকে পুষ্টিগুণ দুই বিচারে এদের জুড়ি নেই। প্রোটিন, ফ্যাট, ফোলেট, ভিটামিন A, B, C, ও E, নিয়াসিন, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ফসফরাস, কপার, পর্যাপ্ত ফাইবার সবই আছে এতে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে *Alocasia macrorrhiza* এবং *Amorphophallus paeoniifolius*। উভয়ই Araceae গোত্রের অর্ন্তভূক্ত। অন্যদিকে খাবারের স্বাদ বাড়াতে অঞ্চল ভেদে নানান মশলা দ্রব্যাদি ব্যাবহরের যে প্রচলন আছে তার মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের চুঁই ঝাল, সিলেটের সাতকরা, উত্তরাঞ্চলের বড় এলাচ এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে চুকাই পাতা উল্লেখযোগ্য।

Moraceae গোত্রের Ficus গণের ক্ষীরী বৃক্ষের মধ্যে ডুমুরকে আমরা সকলেই চিনি বা জানি। পবিত্র কুরআনে তীন নামক

সূরাটিতে এই তীন বা আঞ্জির বা ফিগ বা ডুমুরসহ ৫টি পবিত্র নেয়ামতময় জিনিসের উল্লেখ আছে। এছাড়া ডুমুরের ফল সহ এর অন্যান্য অংশের ভেষজগুণও কম বেশি সকলের জানা। তবে সবজি তরকারী হিসেবেও এর *Ficus hispida* (কাক ডুমুর) প্রজাতিটির ফল তরকারী হিসেবে গ্রামাঞ্চলে খাওয়া হয়। অপ্রচলিত হলেও সবজিটি খুবই সুস্বাদু ও উপাদেয়। আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন স্থানে এটিকে খোসকা বা কুড়ুরো বলা হয়। উল্লেখ্য যে, তীন বা আঞ্জির হল ভিন্ন প্রজতি যার বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus carica*। এছাড়া জগ ডুমুর নামে পরিচিত অন্য একটি প্রজাতি হল *Ficus racemosa*। ডুমুর ফুল বাহ্যিক ভাবে দৃশ্যমান নয়, এটি অন্তপুষ্পি অর্থাৎ ফল কাটলেই দেখা যাবে ভিতরে অনেক ফুল। এর রসালো স্ফীত পুষ্পাক্ষটাই খাদ্য হিসেবে রান্না হয় যা হাইপ্যানথেডিয়মি নামক পুষ্পমঞ্জুরী থেকে জন্মায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ফলটিকে সাইকোনাস বলেন। উদুম্বুর নামক কলসের মত মঞ্জুরীর মধ্যে এক গর্ভপত্রযুক্ত গর্ভাশয়ে একটি করে ডিম্বক ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ফল গুচ্ছাকারে শাখা প্রশাখায় জন্মে। একই গাছে ছোট বড় দুই ধরনের ফল থাকে। ফলের গা খসখসে। এতে পোকা বাসা বাধে খুব। শর্করা সমৃদ্ধ ফলটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আমিষ, চর্বি, ভিটামিন বি-১, বি-২, ক্যালসিয়াম ও কপারসহ নানান প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। বহুমূত্র রোগের প্রয়োজনীয় ভেষজ এটি। এছাড়াও রক্ত পরিশোধন ও কোষ্ঠ কাঠিন্য পরিষ্কার করার ক্ষমতা আছে এর। অনেকে একে বলকারক ও কামোদ্দীপক হিসেবে মনে করে।

পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমানে অপ্রচল হলে কি হবে এককালে কিন্তু এগুলি ছিল বহুল প্রচলিত এবং ঐতিহ্যবাহী। অনামী অথচ দামী পুষ্টিকর এ সকল গ্রাম্য খাদ্য সামগ্রীকে নগর জীবনে তুলে আনতে হবে। ঐতিহ্য যেমন ফিরে ফিরে আসে তেমনি আমাদের দায়িত্ব হল সমকালীন রুচির সঙ্গে মানিয়ে এদের নবায়ন ঘটানোর। উদাহরণ হিসেবে তথাকথিত ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুমকে উল্লেখ করা যায়। উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন ও ফইবারে ভরা অপ্রচলিত খাবারটি বিজ্ঞানী ও সচেতন মানুষের নজরে ও বিবেচনায় এসে জায়গা করে নিয়েছে সুপার সপ্ আর চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যার বাণিজ্যিক উৎপাদন ছাড়িয়ে আজ ল্যাবরেটরিতে কোষ আবাদ পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গঁনে সুপরিচিত ও সমাদৃত। এমনিভাবে অন্যগুলোর প্রতিও মনোযোগ দিলে আমরা একটি রোগমুক্ত, সুস্থ, সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারবো যা সকলেরই কাম্য।

FAUNA OF BHAWAL NATIONAL PARK, GAZIPUR

Mihir Ranjan Dey
Associate Professor and Chairman
Department of Zoology, Khilgaon Model University College, Dhaka-1219.

Md. Shohel Rana
Herpetologist
Sheikh Kamal Wildlife Center, Gazipur, Bangladesh Forest Department.

Introduction:

The Bhawal National Park stands about 40 km north of the capital city Dhaka from where it is easily accessible throughout the year by road. It has been kept under IUCN management category as a protected landscape. This Bhawal National Park, Gazipur was established and maintained as a National Park in 1974 but not declared officially until 1982 under the Bangladesh Wildlife (Preservation) Act, 1974. In 1982 under the gazette notification no.11/For-66/318 dated 11/05/1982 it was declared as the Bhawal National Park, Gazipur.

The forest of Bhawal National Park was the property of Bhawal Zaminders. They used it as their hunting ground. In 1933 the forest area was vested to Forest Department for better management.

This area is home to an incredibly diverse array of flora and fauna. A lush forest canopy created by Sal *(Shorea robusta)* trees once covered the area. Unfortunately illegal deforestation has stripped the area of much of this natural vegetation. New trees and woodlands have been planted in an effort to help the forest recover but it will most likely take many years before they are mature enough to support the incredible animal diversity that was once so common in this area.

The Bhawal National Park is used for education, research and recreation. It is also used for the seized, rescued and recovered wildlife of different species from national and international sources are rehabilitated, preserved and conserved in this National park. It is also a good place for ex-situ conservation of different critically endangered wildlife species. So this park has regional significance. This is also a place of research and breeding center of critically endangered turtle species of River Terrapin *(Batagur baska).*

In fact, Bhawal National Park is a unique habitat for the diverse types of wildlife species but due to rapid urbanization, industrialization, pollution and reckless movement of tourists and local people within the core area the wildlife are under great threat.

Geographic location and Boundary: Bhawal National Park, Gazipur stands between longitude 90◦20′ to 90◦25′ East and latitude 23◦55′ to 24◦00′ North. It comprises seven beats. Such (1) Park Beat (2) Bankharia (3) Baupara (4) Rajendrapur west (5) Baroipara (6) Bhabanipur (7) Bishayakuri-Bari (B.K.Bari). It embraces lands located in the Mauzas of Arishaprashad, Bishayakuri Bari, Baraipara, and Bankharia, Uttar Salna, Baupara, Bhahadpur and Mohana Bhabanipur.

Rainfall and Temperature: Bhawal National Park is a part of Bhawal Gorh and the colour of it's soil is grey. The chemical nature of soil is acidic with PH value is 5.5. The highest temperature in April is 30-34◦ C and lowest temperature in January is 11.7◦ C. The minimum average rainfall is December is 3.4 mm and maximum rainfall in August is 339 mm.

Materials and Methods of survey

The survey was carried out using the following methods:

1. GPS Line Transect Process
2. Random Observation Method
3. Trace Detection (footprints and faeces-urine)
4. Map of Bhawal National Park, Gazipur

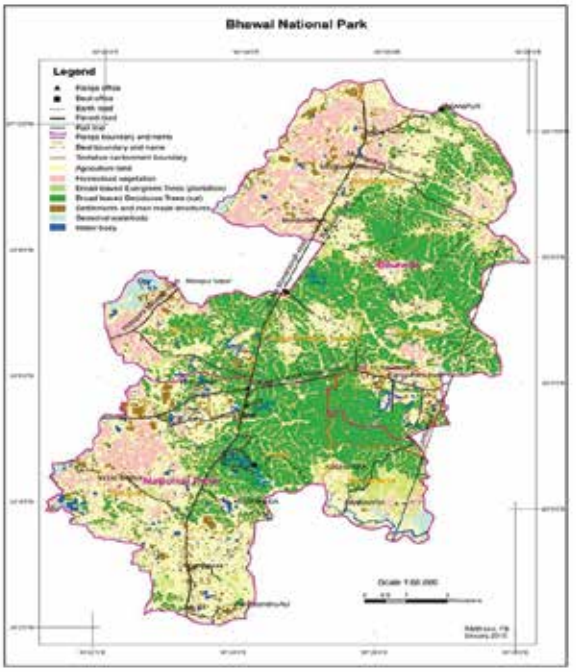

Figure: Map of Bhawal National Park, Gazipur

Secondary Information from FD officials.

This survey was conducted in the year of 2015 under the project of Eco-restoration and Development of Bhawal National Park, Gazipur which is a sub project of Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection Project with the financial assistance of the World Bank. During the Survey time, several meetings were held with the Principal Investigator and other survey members present to discuss about the collected data and the conclusions were drawn based upon it. The survey were done at early mornings, afternoons, evenings, and deep nights in the quietest and non-disturbing way possible. During the rainy season, all types and sizes of animals appear on the forest floor, making the observation fulfilling and worthy. During the survey, observations were made from the footprints, dung and feces of larger animals and the burrows and tunnels made in the ground by the smaller mammals and reptiles. The presence of wildlife around areas where fruit-bearing trees grow has proven to be high. Furthermore, various fishing cats, amphibians and other fish feeders dominated the banks of lakes and ponds.

Fauna of Bhawal National Park, Gazipur: This faunal survey indicates that a total of 118 faunal species exists in Bhawal National Park of which 11 species are Amphibians, 19 species are Reptiles, 70 species are Birds and 18 species are Mammals.

List of Fauna

Wildlife community of Bhawal National Park is composed of 59% birds, 17% reptiles, 15% mammals and 9% amphibians.

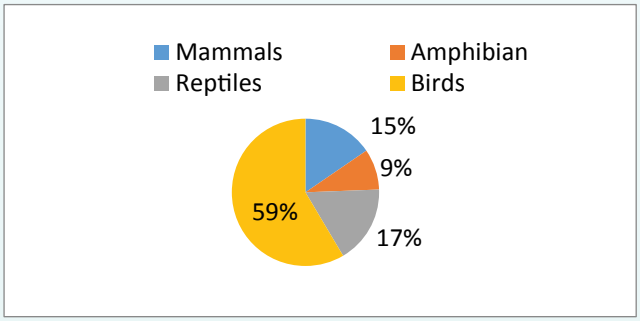

Figure: 2 - Composition of Wildlife community in Bhawal National Park, Gazipur

Amphibian

Amphibians are those vertebrate animals in which aquatic environment is a necessity in a part of their life cycle. Frogs and toads have well developed limbs and the adults lack a tail. Generally, frogs have slender bodies with narrow wraists, while toads are broader in shape. Frogs lie flat on a level surface while toads tend to sit upright. Frogs have slimy, slippery and delicate skin, but toads have driver skin with warts. Frogs also have an amazing variety of colurs- green, yellow, orange, red and black- while toads are unimpressive in appearance. Because of their long, webbed hind feet, frogs can jump and leap very far while toads cannot leap very far or jump very high because of their short hind legs and bulky frame. Toads walk instead of hopping. All toads have poison (Parotid) glands behind their eyes, but few frogs have poison glands. Frogs are both diurnal and nocturnal but toads are almost exclusively nocturnal (Feeroz et al 2011).

Eleven (11) species of frogs and toads were recorded from Bhawal National Park, Gazipur during this study.

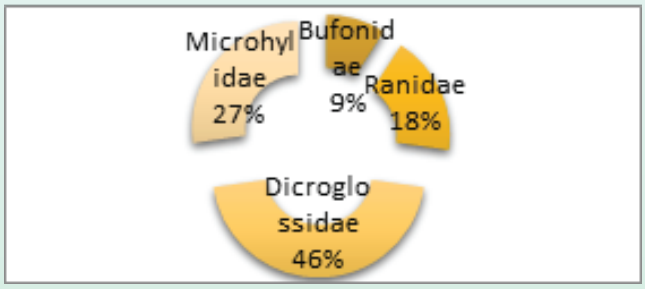

Figure 3: The comparison of abundance of Amphibian species in family basis

Reptiles: Reptiles are cold-blooded vertebrates and their bodies are covered with scales or scutes which help to conserve body moisture. Retiles do not require a water environment during their life cycle. They prefer a wide range of habitats from water bodies to dry regions. Reptilian's body temperature varies with the environmental conditions. Therefore, they go for hibernation during winter. They have a low metabolic rate and produce comparatively less body heat than birds and mammals. Reptiles are most of carnivores and play an important role in biological pest control.

During this study a total number of 19 species of reptiles were recorded at Bhawal National Park, Gazipur. Among 19 species of reptalian, 04 types of turtle and tortoise, 07 types of lizard, 08 types of snake of them.

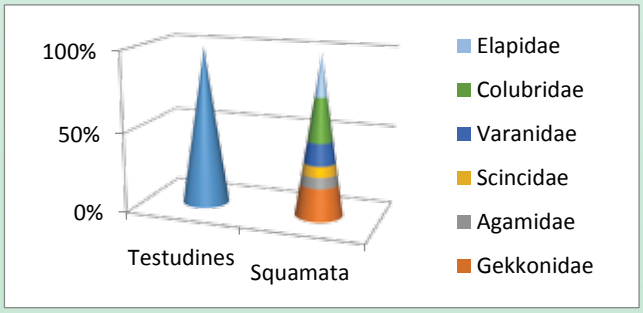

Figure 4: Graph showing the comparison of abundance of species in order basis

Birds: Birds are warm-blooded vertebrate animals with feathers and a bill. There have adapted to a wide range of habitats. There are mainly arboreal and aerial, yet some species are mainly terrestrials. Birds make a nest where they lay their eggs. The nestlings stay in the nest until they have grown

feathers.

Bhawal National Park, Gazipur reveals the occurrence of 70 species of birds, among most of the species are common resident and not threatened.

Mammals: Mammals are warm-blooded vertebrate animals with mammary glands. The body is

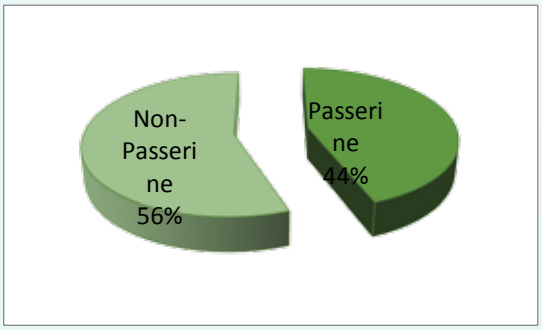

Figure 5: Status of birds in the Bhawal National park, Gazipur of Bangladesh on category basis

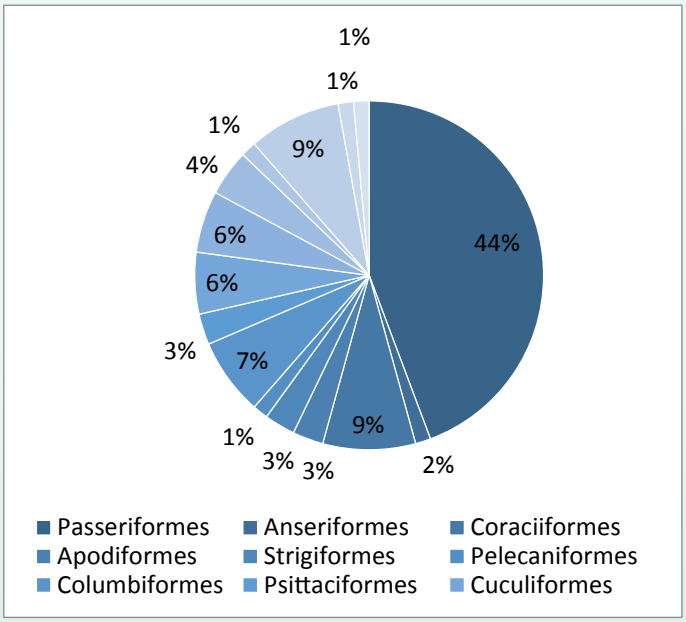

Figure 6: Pie chart showing the comparison of abundance of species in order basis.

usually covered by hairy coat and the skin has numerous glands. Mammals can live on land, in trees, under water or underground. Some mammals are able to fly or glide. Of all the animals, mammals are the most developed group. Seventeen species of mammals are recorded from Bhawal National park, Gazipur during this study.

Threats of Bhawal National Park, Gazipur: There are many spinning mills, washing plants

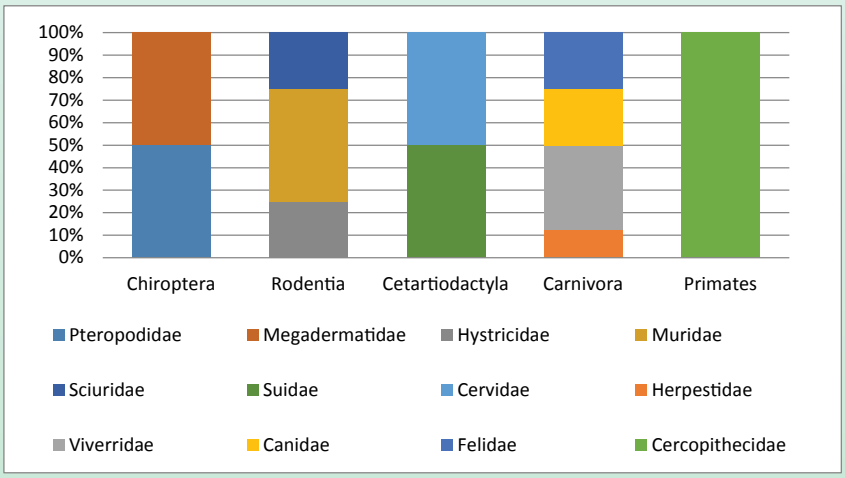

Figure 7: Pie chart showing the comparison of abundance of species in order basis.

garment industries, farms, resorts, convention halls and tribal villages and habitations, barracks and staffs quarters in this area. The Rajendrapur Cantonment, RAB Forces training centers and offices Air force base, central ammunition Depot. Bangladesh institute of peace Support Training

Centre, Bangladesh Security Printing Press, Bangladesh Ordnance Factory many schools, colleges, different government and non-government offices and other institutions are established in the Bhawal National Park area.

The Dhaka- Mymensingh National Highway, Dhaka- Mymensingh Railway line, High powered electric supply lines and other service lines exerts a great threat to the existence of bio-diversity of this area.

Expansion of the Gazipur City Corporation creating massive road and service networks, other subsequent development efforts creates tremendous impacts on this eco system.

This National Park is in the middle of the industrial zone and the population of the surrounding localities possess a great threat to this park. The forest area inside this National Park is not compact and continuous Agricultural lands stand in between the forest of this National Park. Villager's right still prevails here which sometimes possess a great threat to the conservation of domestic, released animals of this park. The villagers normally collects their fuel wood, leaf-litter, poles, tools handle etc. by cutting copies, seedlings, saplings and pole sized trees. They consider this their rights. Every year number of tourists and hence revenue figures increased. Due to fund constraints the maintenance and developmental activities are not keeping pace with.

Recommendations

In order to make this natural ecosystem a rich habitat to support varieties of biodiversity and wildlife, the following steps need to be adopted:-

1. Intensive plantation by medicinal and fruit-bearing species of wildlife is needed on the available palatable lands.
2. Stop cultivation and grazing in the low-lying lands within the Bhawal National park.
3. Limiting the operation of the existing factories and impose ban on establishment of new industries around the Bhawal National Park.
4. Control the number of visitor into the Park based on carrying capacities.
5. Control the entrance of tourist vehicles or other transport into the core area of Bhawal National Park.
6. Playing of the loudspeakers brought by the picnickers need to be controlled so that it does not disturb the wildlife.
7. Relocate the Kuch indigenous population, living near the Park to other areas.
8. Train and educate the patrolmen and forest officers on the importance of protecting the biodiversity.
9. The adjacent and intermingled private braid lands (Low-lying lands) need to be acquired for the interest of the Bhawal National Park.
10. Hunters and poachers movement are to be monitored intensively in the Bhawal National Park.
11. Intentional ground firing, coppice and seedling cutting in the summer time need to be controlled strongly.
12. Releasing of wildlife which are captured, seized and rescued from different habitats need proper control.
13. To release the captured, seized, rescued, wounded and sick wildlife separate rescue and rehabilitation enclosures need to be constructed.